ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৩
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবি'র মতামতের প্রতিফলন, যার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবি'র।

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
এম. হাফিজউদ্দিন খান, সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম. আকরাম ও **মো. ওয়াহিদ আলম**, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহায়তা

খোন্দকার ফাতেমা জারা, **আব্দুস সাত্তার** ও **দিলরুবা আফরোজ**, গবেষণা সহকারী, টিআইবি

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN : 978-984-33-7981-8

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা এবং নিরপেক্ষতা – এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, অ্যাডভোকেসিসহ নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে টিআইবি একদিকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। টিআইবি তার এই অবস্থান থেকে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক' (সিজিএ)-এর কার্যালয়ে বিরাজমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিজিএ কার্যালয় বাংলাদেশ সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ব্যয়ের দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রহরী হিসেবে কাজ করার কথা। সিজিএ অর্থবছর ভিত্তিক হিসাব প্রতিবেদন বা বিবরণী তৈরি করে এবং তা মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) এর অনুমোদন-সাপেক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয় এই হিসাবের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী বছরের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

গত কয়েক বছরে সিজিএ কার্যালয়ে হিসাবরক্ষণ স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) করার মত বহু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও জনবলের ঘাটতি, কর্মদক্ষতার ঘাটতি, আইনগত সীমাবদ্ধতা, মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, অফিস স্থাপনা ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধার ঘাটতিসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম বিরাজমান থাকায় প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যাশিত পর্যায়ের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। সিজিএ কর্তৃক প্রদানকৃত প্রতিবেদন সময়মত না হওয়া ও সরবরাহকৃত তথ্য নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, ফলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। সিজিএ'র ওপর প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে এগিয়ে নিতে সরকারসহ সব স্টেকহোল্ডারের সাথে সম্মিলিতভাবে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে টিআইবি আগ্রহী।

টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিপু রায়ের নেতৃত্বে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাকে সহায়তা করেছেন খোন্দকার ফাতেমা জারা, আব্দুস সাত্তার ও দিলরুবা আফরোজ। এছাড়া তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, মোহাম্মদ ওয়াহিদ আলম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনজুর-ই-খোদা। প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে এই বিভাগের সহকর্মীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দিয়েছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও সদস্য এম. হাফিজ উদ্দিন খানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শের জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা ও সরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে গবেষণা দলকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে সিজিএ অফিসের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, সিজিএ অফিস কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ও সিজিএ চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং তাদের মূল্যবান মতামত নেওয়া হয়। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিজিএ অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা দূর করে একে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও জবাবদিহি করে তুলতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ iii
সারণির তালিকা vi
শব্দ সংক্ষেপ vii

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ০১

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.২ গবেষণার পরিধি
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি
১.৪ গবেষণা কাল
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও আইনগত কাঠামো ০৪

২.১ সিজিএ অফিসের প্রতিষ্ঠা ও গঠন
২.২ সিজিএ অফিসের আইনগত কাঠামো
২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল
২.৪ সিজিএ অফিসের কার্যক্রম
২.৫ বাজেট
২.৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ
২.৭ সিজিএ অফিসের সংস্কারের জন্য গৃহীত প্রকল্প
২.৮ কল্যাণ সমিতি
২.৯ নাগরিক সনদ
২.১০ ওয়েবসাইট

তৃতীয় অধ্যায়: আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ১৪

৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা
৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৩.২.১ প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব
৩.২.২ হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব
৩.২.৩ সময়মত হিসাবের প্রতিবেদন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ
৩.২.৪ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অর্গানোগ্রামে সমস্যা
৩.২.৫ সিএজি, সিজিএ ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়ে সমস্যা
৩.২.৬ জবাবদিহিতায় সমস্যা
৩.২.৭ সিজিএ'র কার্যক্রমের ওপর সচিবালয়ের হস্তক্ষেপ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেডিং এ সমস্যা
৩.২.৮ দক্ষতা অনুসারে কাজের বন্টন না হওয়া

৩.২.৯ অফিস স্থাপনা ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব
৩.২.১০ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব
৩.২.১১ প্রশিক্ষণে সমস্যা
৩.২.১২ অপর্যাপ্ত বাজেট
৩.২.১৩ নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতা

চতুর্থ অধ্যায়: সিজিএ অফিসের অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৩

৪.১ নিয়োগ, পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.২ নতুন বেতন স্কেল সংযোজনে (Fixation) দুর্নীতি
৪.৩ প্রথম বেতন ও বোনাস পেতে দুর্নীতি
৪.৪ প্রকল্প ও ঠিকাদারের বিলে দুর্নীতি
৪.৫ গাড়ির তেল/গ্যাস খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি
৪.৬ ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিলে দুর্নীতি
৪.৭ ক্যুরিয়ার বিলে দুর্নীতি
৪.৮ শ্রমিক মজুরির বিলে দুর্নীতি
৪.৯ ভ্রমণ ও দৈনিক (টিএ, ডিএ) ভাতা বিলে দুর্নীতি
৪.১০ আনুষঙ্গিক (কন্টিজেন্সি) বিলে দুর্নীতি
৪.১১ পেনশন পেতে দুর্নীতি
৪.১২ টাইম স্কেল ফিক্সেশন ও বকেয়া বেতন পেতে দুর্নীতি
৪.১৩ এলপিসি নিতে দুর্নীতি
৪.১৪ ঋণ ও জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের একাউন্ট স্লিপ পাঠানো ও এই ফান্ডের টাকা অগ্রিম উত্তোলনে ঘুষ প্রদান
৪.১৫ অন্যান্য কাজ করাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.১৬ সিজিএ অফিসের ঘুষ নেওয়ার সার্বিক চিত্র
৪.১৭ ঘুষ নেওয়ার কারণ হিসেবে সিজিএ অফিসের ব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিসাব রক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা ৪৯

৫.১ ভারতের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা
৫.২ পাকিস্তানের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা
৫.৩ শ্রীলংকার হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা
৫.৪ যুক্তরাজ্যের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা
৫.৫ নিউজিল্যান্ডের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা
৫.৬ বাংলাদেশে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব রক্ষণের বাধাসমূহ

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ৫৪

সারণির তালিকা

সারণি ২.১: সিজিএ অফিসে কর্মরত জনবল ০৮
সারণি ৪.১: নতুন বেতন স্কেল সংযোজন করাতে সিজিএ অফিসে প্রদানকৃত ঘুষের পরিমাণ ৩৬
সারণি ৪.২: ঠিকাদারী বিলে ঘুষের পরিমাণ ৩৭
সারণি ৪.৩: সিজিএ অফিসের ঘুষ নেওয়ার সার্বিক চিত্র ৪৬
সারণি ৫.১: বিভিন্ন দেশের হিসাবরক্ষণ অফিসের কাঠামোগত তুলনামূলক চিত্র ৫২
সারণি ৫.২: বিভিন্ন দেশের হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র ৫৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির ফ্লো চার্ট ০৯
চিত্র ২: বিল পাশ প্রক্রিয়া ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ১০
চিত্র ৩: কর্মরত জনবল ও শূন্য পদের শতকরা হার ১৬
চিত্র ৪: সিজিএ অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতার সার্বিক চিত্রের ফ্লো চার্ট ৩১

শব্দ সংক্ষেপ

ACR	Annual Confidential Report
ADG	Additional Director General
AG	Accountant General
AGB	Auditor General of Bangladesh
BF	Benevolent Fund
BSR	Bangladesh Service Rules
CA	Chartered Accountant
CAG	Comptroller and Auditor General
CAO	Chief Accounts Officer
CBA	Collective Bargaining Agent
CDPU	Central Data Processing Unit
CGA	Controller General of Accounts
CGDF	Controller General of Defense Finance
CORBEC	Committee on Reform in Budgeting and Expenditure Control
CRU	Central Reconciliation Unit
DA	Daily Allowences
DAO	District Accounts Officer
DC	District Comissioner
DCA	Divisional Controller of Accounts
DDO	Drawing and Disbursment Officer
DFID	Department for International Development
DG	Director General
DMTBF & SFA	Deepening Medium Term Budgetary Framework & Strengthening Financial Accountability
EBSR	East Bengal Service Rule
ERD	Economic Relations Divisions
FIMA	Financial Management Academy
FMRP	Financial Management Reform Program
FR	Fundamental Rule
FSMU	Financial Systems Management Unit
GD	Group Discussion
GFR	General Financial Rules
GI	Group Insurance
GPF	General Provident Fund
GSR	Government Service Rules
IBAS	Integrated Budgeting & Accounting System
ICMAB	Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh

LPC	Last Pay Certificate
MLSS	Member of Lower and Subordinate Staff
NBR	National Board of Revenue
PL	Pension Liabilities
PLI	Postal Life Insurance
PPO	Pension Payment Order
PR	Pension Rules
PSC	Public Service Comission
REBEC	Reform in Budgeting and Expenditure Control Project
RNE	Royal Norwegian Embassy
SDFP	Sub Delegation Financial Power
TA	Travel Allowences
TR	Treasury Rules
UAO	Upazilla Accounts Officer
UNO	Upazilla Nirbahi Officer
WAN	Wide Area Network

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ ও কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানসম্মত হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী জরুরি। সরকারি দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা জনসম্মুখে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি সম্পদের ব্যবহার এবং সরকারের অর্থ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বন্টনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী একটি পূর্ণ চিত্র প্রদান করে। সরকারের আর্থিক সম্পদের উৎস কী, এই সম্পদ কিভাবে বরাদ্দ ও ব্যবহার করা হয়, কিভাবে সরকার তার কার্যক্রমের জন্য অর্থ প্রদান করে এবং নগদ অর্থের প্রয়োজন মেটায়, সরকারের আর্থিক ক্ষমতা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমনঃ সরকারের দায় ও প্রতিশ্রুতি কী, সরকারের আর্থিক অবস্থান কেমন এবং এর পরিবর্তন কিভাবে হয় সরকারি আর্থিক বিবরণী সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে।[১] দুর্বল হিসাবরক্ষণ নীতি ও কাঠামো ভুল তথ্য সরবরাহ করে; আর ভুল তথ্যের মাধ্যমে সরকার ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যা অনিবার্যভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে। হিসাবরক্ষণ নীতি যদি ব্যক্তি স্বার্থে অপব্যবহার করা হয়, তা জাতীয় অর্থনীতির যথাযথ চিত্র দিতে ব্যর্থ হয়। সরকারি ব্যয়ের দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রহরী হিসেবে হিসাবরক্ষণ কাজ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা, সুশাসন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে আর্থিক প্রতিবেদনের তুলনা, আর্থিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা/বিশ্বাসযোগ্যতা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।[২]

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে 'হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক (সিজিএ) অফিস'। এই অফিসের সরবরাহকৃত সময়মত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপরেই সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়া নির্ভর করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুসারে এ অফিস হিসাবের তথ্য সরবরাহ করে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিসের হিসাবরক্ষণ, সংকলন এবং তা সুসংহত করার দায়িত্ব সিজিএ'র। এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ব্যয় ও আত্মসাৎ ইত্যাদির রেকর্ড রাখে। সরকারি বিল পাস করার পূর্বে তাতে কোনো প্রশাসনিক, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে কিনা তা এই অফিস যাচাই করে। এই অফিস সরকারের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব করে প্রতি অর্থ বছরে হিসাব প্রতিবেদন বা বিবরণী তৈরি করে যা মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) এর অনুমোদনের পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় এই হিসাবের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের বাজেট তৈরি করে।

গত কয়েক বছরে সিজিএ অফিসের বহু পরিবর্তন হয়েছে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে সিজিএ অফিসকে সিএজি অফিস থেকে আলাদা করা, সিজিএ অফিসের হিসাবরক্ষণ স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্টাফদের সততার সাথে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনারের আয়োজন, নাগরিক সনদ তৈরি ও সিজিএ'র নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা। হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অটোমেশন হওয়ার ফলে

---

[১] K. P. Kaushik, Government Accounting: Recent trends and direction for Idia, January 2006

[২] A Study on Accrual-Based Accounting for Governments and Public Sector Entities (PSEs) in SAARC Countries, www.esafa.org/.../Study-Accrual_Accounting_in_SAARC_Governments_1.pdf

সিজিএ প্রধান, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সার্ভারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ আয় ও ব্যয়ের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব।

সিজিএ অফিসের উপোরোক্ত পরিবর্তন সাধিত হলেও এখনও এর কিছু সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যার মধ্যে জনবলের অভাব, তাদের কর্মদক্ষতার অভাব, আইনগত সীমাবদ্ধতা, সিজিএ'র কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, অফিস স্থাপনা ও লজিস্টিক সুবিধার অভাব, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে সিজিএ অফিসের কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে টাকা ছাড়া কোথাও ফাইল নড়ে না। দুর্নীতির আখরায় পরিণত হয়েছে হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তর।[৩] পেনশন, অগ্রিম প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন, টাইম স্কেল ও নতুন পে স্কেল সংযোজন, চাকরি স্থায়ীকরণসহ বিভিন্ন ধরনের বিল পাস করাতে ঘুষ প্রদান, দিনের পর দিন হয়রানি, বিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ নাই বলে বিল ফেলে রাখা, বিল হারিয়ে ফেলা, হিসাবের প্রতিবেদন তৈরিতে বিলম্ব করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানি উল্লেখযোগ্য।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্নীতি রোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন রকম গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ক্যাম্পেইন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি ২০০৩ সালে সিএজি অফিসের ওপর একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছিল। এই প্রতিবেদনে সিজিএ অফিসের উপরোক্ত সমস্যাসমূহ বিস্তারিত আলোচিত না হওয়ায় সিজিএ অফিসের সমস্যা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সিএজি'র ওপর টিআইবি যে গবেষণা করেছে তারই পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সিজিএ অফিসের সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য

১. সিজিএ অফিসের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা
২. সিজিএ অফিসে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রক্রিয়া, কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করা
৩. সিজিএ অফিস যেন স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তার জন্য সুপারিশ প্রদান করা

১.২ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় সিজিএ (সিভিল) এর আইনি, কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ গুণবাচক তথ্যভিত্তিক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (জিডি), পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[৩] জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ২০১০

১.৩.১ তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সিজিএ ও সিএজি অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ। এই গবেষণায় সিজিএ অফিসের মাধ্যমে বিল অনুমোদন করাতে সরকারি অফিসগুলো কী ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয় তা জানার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিজি অফিস, ডিপার্টমেন্ট ও বোর্ডসহ ৩০টি সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা, সিজিএ ও সিএজি অফিসের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে চেক লিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট, সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা, সংবিধান, সিএজি ও সিজিএ প্রকাশনা, ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ।

১.৩.২ তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই

এই গবেষণায় গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে কমপক্ষে তিনটি উৎস থেকে তার সত্যতা যাচাই করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা কাল

সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সরকারি অফিসগুলো দেশের বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সকল অফিস থেকে তথ্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদন মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। সিজিএ অফিসের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কর্ম পরিধির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে সিজিএ অফিসের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সিজিএ অফিসের অনিয়ম, দুর্নীতির ধরন, দুর্নীতির ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি হিসাবরক্ষণ ও অডিটর জেনারেল অফিসের সাথে বাংলাদেশ সরকারের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। সবশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিজিএ অফিসে বিরাজমান সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও আইনগত কাঠামো

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার নাম 'বাংলাদেশ হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক (সিজিএ)' কার্যালয়। পূর্বে এই অফিসের কাজ সিএজি অফিস নিরীক্ষা কাজের পাশাপাশি সম্পন্ন করত। এই অফিস প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশ সরকারের হিসাব বিভাগীকরণের নবযুগ শুরু হয়। সিজিএ অফিস প্রতিষ্ঠার পর থেকে সিএজি'র ওপর চাপ অনেকটা কমে যায়। এই অফিসের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রথমেই এর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্ম পরিধি, জনবল, বাজেটসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সিজিএ অফিসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

২.১ সিজিএ অফিসের প্রতিষ্ঠা ও গঠন

সিজিএ অফিস ১৯৪৭ সালে প্রাথমিকভাবে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিস নামে প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল - এজি (সিভিল), বাংলাদেশ নামে কাজ শুরু করে। এ সময়ে এজি অফিস সিএজি অফিসের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কাজ করত। অডিট থেকে হিসাব বিভাগের কার্যক্রম আলাদা করার জন্য ১৯৮৩ সালে সংশোধনাদিসহ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এডিশনাল ফাংশনস্ অ্যাক্ট ১৯৭৪ সালের ২৪নং আইন সংযোজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে সিএজি'র আওতাধীন হিসাব সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপরে ১৯৮৫ সালে অর্থ বিভাগ এর একটি অফিস মেমোরেন্ডাম এর মাধ্যমে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে মন্ত্রণালয় অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবিধান অনুসারে সিজিএ অফিস সিএজি'র অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। তবে কার্যত এটি সিএজি থেকে ভিন্ন। ২০০২ সালের ১৭ জুন অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারের হিসাব দেখাশুনা করার জন্য সিজিএ অফিসকে সিএজির অডিট বিভাগ থেকে আলাদা করে দায়িত্বভার অর্পণ করে। সিজিএ বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অফিস।

২.২ সিজিএ অফিসের আইনগত কাঠামো

সিজিএ অফিসের কার্যাবলী নিচের এ্যাক্ট, রুলস ও ম্যানুয়াল দ্বারা পরিচালিত হয়

- দি কম্পট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪
- দি কম্পট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫
- কোড অফ অ্যাকাউন্টস
- ট্রেজারী রুলস্
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ (জিএফআর)
- বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস
- পেনশন রুলস
- সিজিএ ম্যানুয়াল

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাবলে জারিকৃত বিভিন্ন আদেশের[৪] মাধ্যমেও সিজিএ'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নে ট্রেজারি রুলস, জিএফআর, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস ও ম্যানুয়াল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ট্রেজারি[৫] রুলস

আর্থিক প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রসার, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সরকারি অর্থের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম ট্রেজারি রুলস ও সাবসিডিয়ারী রুলস জারি করা হয়। এই ট্রেজারি রুলস তিন খণ্ডে বিভক্ত।[৬]

ট্রেজারি রুলের প্রথম খণ্ডে সরকারের হিসাবের অর্থ গচ্ছিত রাখার পদ্ধতি, ট্রেজারিসমূহ নিয়ন্ত্রণের সার্বিক পদ্ধতি, সরকারের রাজস্ব সরকারি হিসাবে গচ্ছিত রাখা, তার সংরক্ষণ, হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তর, উত্তোলনের দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহ কেমন হবে তা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষক অফিস, শুল্ক ভবন এবং ট্রেজারির সাধারণ সংগঠন এবং কার্যপদ্ধতি, সরকারি অর্থ প্রাপ্তি এবং সরকারের হিসাবে উক্ত অর্থ প্রদান, সরকারের হিসাবে রক্ষিত অর্থের সংরক্ষণ, সরকারের হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন বিধি (বেতন, ভাতা, পেনশন, বিভিন্ন ধরনের বিল, সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, ভান্ডার ক্রয়, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি খাতে উত্তোলন), ব্যাংকে জমার সাধারণ বিধিসমূহ, সরকারের স্থায়ী-অস্থায়ী ঋণ জমা পদ্ধতি, অর্থ জমা প্রাপ্তি ও পরিশোধ (রাজস্ব জমা, দেওয়ানি আদালত জমা, ফৌজদারি আদালত জমা, ব্যক্তিগত জমা ইত্যাদি), ঋণ ও অগ্রিম উত্তোলন ও পরিশোধ পদ্ধতি, সরকারি হিসাবে গচ্ছিত অর্থের স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে নির্বাহী নির্দেশনা ও আদেশ সংকলিত হয়েছে যা মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এর প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত সোনালী ব্যাংক কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশিকা হিসেবে প্রণীত। নগদ স্থিতি, মুদ্রা ও ব্যাংক নোটের মূল্যমান, প্রাপ্তি ও ইস্যু ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সরকারের হিসাবের স্থিতি সরকারের নগদ স্থিতি হিসেবে ধরা হয়।

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর)

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিধিমালা। এটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত এবং এই বিধিমালায় বর্ণিত বিধানসমূহ একাউন্ট কোড এবং ট্রেজারি কোডের অতিরিক্ত। মূলত এই বিধিসমূহ রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশাবলী। এখানে প্রধানত সরকারের অধস্তন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে এইগুলো অনুসরণীয়। ১৫টি অধ্যায় সম্বলিত এই বিধিমালায় যেসকল বিষয়ে বিধি সংযুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের সার্বিক

---

[৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mofbd.org ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moestabd.org।

[৫] "ট্রেজারি" বলতে বুঝাবে জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস এবং জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সকল কিংবা যেকোনো কর্মনির্বাহের বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার অফিস; বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস ও শাখাসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি যারা সরকারি হিসাবে অর্থ প্রাপ্তি এবং পরিশোধের বিষয়ে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত; শুল্ক ট্রেজারি; এবং জেলা প্রশাসকের অফিসের যে অংশ অফিস, স্ট্যাম্প, মূল্যবান সামগ্রী এবং সরকারি সম্পত্তি জিম্মার কাজ নির্বাহ করে সেই অংশ।

[৬] বিস্তারিত জানতে দেখুন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mofbd.org ও চক্রবর্তী রনজিৎ কুমার, ট্রেজারি রুলস এবং উহার অধীন প্রণীত সাবসিডিয়ারি রুলস্, (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯।

ব্যবস্থা বিষয়ক বিধিমালা। এখানে সরকারের অর্থ প্রাপ্তি; রাজস্ব নির্ধারণ, সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ; সরকারের তহবিল হতে অর্থ ব্যয়; ব্যয় নিয়ন্ত্রণ; অনিয়ম, অপচয় এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ নিবারণমূলক ব্যবস্থা, হিসাবরক্ষণ সম্পর্কে করণীয় ইত্যাদি বিষয় এখানে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও রাজস্ব আদায় ও তার প্রাপ্তি সম্পর্কিত বিধিমালা অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের রাজস্ব সংগ্রহ ও মওকুফ সম্পর্কিত বিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জিএফআর এ আলোচনা করা হয়েছে।[৭]

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস

ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৫ এর ক্ষমতাবলে ১ মে, ১৯৫৩ তারিখে তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের জন্য ইস্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুলস দুই খণ্ডে জারি করা হয়। এই সার্ভিস রুলস ১ মে, ১৯৫৩ তারিখে জারি করা হলেও এর ভূতাপেক্ষিক কার্যকারিতা দেওয়া হয় ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সাল হতে। পরবর্তী পর্যায়ে এই সার্ভিস রুলসের নাম পরিবর্তন করে ইস্ট পাকিস্তান সার্ভিস রুলস রাখা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর Bangladesh (Adoption of Existing Bangladesh laws) Order, 1972 (P.O. No. 48 of 1972) দ্বারা এটি বাংলাদেশে প্রযোজ্য এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বিএসআর)। উল্লেখ্য এটি তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের জন্য প্রণীত হলেও রাষ্ট্রপতি উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৮ অনুসারে এটি বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য করেন। দুই খণ্ডে বিভক্ত এই বিধিমালার প্রথম খণ্ডে চাকরির সাধারণ শর্তাবলী, বেতন, ভাতা, নিয়োগবিধি, ছুটি, অবসর, পেনশন ইত্যাদি বিষয়ক বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বাইরে প্রেষণে নিয়োগ, বাধ্যতামূলক অবসর, পদে যোগদানের সময়কাল ইত্যাদি পাবার বিধি-বিধানসমূহ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ক্ষতিপূরণ ভাতা নিয়ন্ত্রণকারী বিধিসমূহ আলোচিত হয়েছে। এই বিধিমালা রাজস্বখাতভুক্ত সকল সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আবার বিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্পোরেশনের নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য কোনো আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা বর্ণিত না থাকলে এই বিধিমালার বিধান প্রযোজ্য হবে।[৮]

সিজিএ ম্যানুয়াল

অ্যাকাউন্ট কোড, ফিন্যান্সিয়াল রুলস ও একাউন্ট ট্রেজারি কোডগুলোকে অনুসরণ করে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ও রয়েল নরওয়েজিয়ান অ্যাম্বাসি (আরএনই) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট এর মাধ্যমে তৈরি করা হয় চারটি ম্যানুয়াল। এই ম্যানুয়ালগুলো ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে করা হয়। ম্যানুয়ালগুলো চূড়ান্ত করতে হলে সিএজি'র অনুমোদন সহকারে সংসদ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন। যেহেতু তা করা সময়সাপেক্ষ ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয় সেহেতু এগুলো এখনও খসড়া পর্যায়ে রয়েছে। তবে বর্তমানে এই ম্যানুয়ালগুলো অনুসরণ করেই সিজিএ অফিসের কার্যক্রম চলছে। সিজিএ অফিসের নিয়ন্ত্রণে যে চার ধরনের অফিস যেমনঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সিএও), বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (ডিসিএ), জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ডিএও) ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ইউএও) এর অফিস রয়েছে সেসব অফিস কিভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা এই ম্যানুয়ালগুলোতে আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

[৭] বিস্তারিত জানতে দেখুন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mofbd.org এবং মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১ ও চক্রবর্তী রনজিৎ কুমার, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস, (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯।

[৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mofbd.org ও মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট ১ ও পার্ট ২, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য কার্যকর মাসিক ও বাৎসরিক হিসাব তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়কে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দেওয়াই হচ্ছে এই ম্যানুয়ালগুলোর উদ্দেশ্য। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার হিসাবের কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করার জন্য এই ম্যানুয়ালে প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালী, ফরম এবং রেকর্ড এর নির্দেশনা দেয়। এই ম্যানুয়াল নতুন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয় যা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের নিকট সকলের কাম্য। কিছু ফরম ও রেজিস্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী সিএও, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা হিসাব অফিসসমূহে কার্যাবলী পরিচালিত হয় যা এই ম্যানুয়ালগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। চারটি ম্যানুয়ালে ১ নম্বর থেকে ১৭ নম্বর পর্যন্ত মোট ১৭টি রেজিস্টার বুক রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের প্রদত্ত মাসিক হিসাবের সংশোধনীর জন্য জার্নাল তৈরি করা হয় যা এই ম্যানুয়ালে উল্লেখ রয়েছে। ইস্যুকৃত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ক্যাশ করানো চেকসমূহের সামঞ্জস্যবিধান করা সিএও অফিসগুলোর অবশ্য দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় সামঞ্জস্যবিধান ইউনিট (সিআরইউ) এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে থাকে। প্রতি মাসের শেষে সিএও ডাটাবেজ থেকে সিআরইউ সকল চেক ডাটা স্থানান্তর করে। এর ভিত্তিতে সিআরইউ টাকার অংকে গড়মিল, তারিখে অমিল, তারিখ ও টাকার অংকে গড়মিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী চেকের গড়মিল, চেক ও বিলের অংকগুলো মিলিয়ে দেখা, যে সকল চেক এখনো ধরা হয় নাই তাতে কত সময় লাগবে, রিপোর্ট সংশোধনী ইত্যাদি সংশোধনী করে থাকে। এছাড়াও কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি করায় যাতে ভুল না হয় তার জন্য কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ডাটা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিও এই ম্যানুয়ালে উল্লেখ রয়েছে।[৯]

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন সিজিএ অফিসের প্রধান। সিজিএ অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুইজন অতিরিক্ত সিজিএ এবং ১০ জন ডেপুটি সিজিএ রয়েছেন। এছাড়া সিজিএ-এর কার্যক্রম ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪৯ জন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(সিএও), ৬ জন বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক (ডিসিএ), ৫৮ জন (জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা) ডিএও এবং ৪১৭ জন উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ইউএও) রয়েছে।[১০]

সিজিএ অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশব্যাপী চার স্তরের অফিস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস: এই অফিসগুলো ঢাকায় সিজিএ অফিসেই অবস্থিত। এই অফিসগুলো সরকারের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক। বর্তমানে মোট ৪৯টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস রয়েছে।

২. বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস: এই অফিসগুলো সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থিত। বর্তমানে সারাদেশে মোট ছয়টি বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস রয়েছে।

৩. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস: এই অফিসগুলো জেলা শহরে অবস্থিত। বর্তমানে জেলা পর্যায়ে মোট ৫৮টি ডিএও অফিস রয়েছে। বিভাগীয় শহরগুলোতে যেহেতু বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস রয়েছে এজন্য এই জেলাগুলোতে ডিএও এর অফিস নেই।

৪. উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস: এই অফিসগুলো সারা দেশের উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য এগুলো কাজ করে থাকে। বর্তমানে

---

[৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন সিজিএ ওয়েবসাইট www.cgabd.org ঠিকানায় সিজিএ ম্যানুয়াল।

[১০] সিজিএ অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ১ এর অর্গানোগ্রাম ।

দেশে মোট ৪১৭টি ইউএও অফিস রয়েছে। জেলা পর্যায়ে সদর উপজেলায় এবং বিভাগীয় শহরে যেহেতু একটি করে সিজিএ অফিস রয়েছে তাই এসব এলাকায় আলাদা করে উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস নেই।

সারণি ২.১ সিজিএ অফিসের কর্মরত জনবল

পদের নাম	সংখ্যা
প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৬৫৭
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	২২৫
তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	৩৩৮২
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৬১৮
মোট	৪৮৮২

বর্তমানে সিজিএ অফিসে মোট ৪৮৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৬৫৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২২৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ৩৩৮২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৬১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

সিজিএ অফিসে মোট ১৫টি শাখা রয়েছে। এই শাখাগুলোর মাধ্যমেই এই অফিসের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন হয়।[১১]

২.৪ সিজিএ অফিসের কার্যক্রম[১২]

সিজিএ অফিস যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলোকে প্রধান তিনটি সেক্টরে ভাগ করা যায়। নিচে এই অফিসের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. হিসাবরক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলী

১. সরকারের সকল সিভিল হিসাব দেখার দায়িত্ব সিজিএ'র। এছাড়াও সিজিডিএফ (Controller General of Defence Finance) এবং রেলওয়ের তৈরিকৃত নিজস্ব হিসাবও চূড়ান্তভাবে সিজিএ'র কাছে পাঠানো হয়। নিচে সিজিএ'র হিসাব তৈরির একটি ফ্লো চার্ট প্রদান করা হলো। চার্টে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস, এজিডি রেলওয়ে, সিজিডিএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমস্ত হিসাব সিজিএ অফিসে পাঠানো হয়। সিজিএ অফিস সমস্ত বিভাগের হিসাব একত্র করে উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করে। সিএও অফিসগুলো যেহেতু মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সেহেতু এ অফিস অনুসারে যে হিসাব তৈরি হয় তা মন্ত্রণালয়গুলোতে চলে যায়। আবার সিএও অফিসগুলোর হিসাব চূড়ান্ত করার পূর্বে পূর্ত, সওজ, ডাক, টিঅ্যান্ডটি'র মত যেসব অফিসের অর্থ সরাসরি ব্যয় করার ক্ষমতা রয়েছে সেসব অফিসের হিসাব সিএও অফিসে চলে আসে। উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের হিসাবও জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস বা বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিসে জমা দেওয়ার পরে তা সিজিএ অফিসে চলে আসে। এভাবে সিজিএ অফিস উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করে সিএজি'র নিকট তা প্রেরণ করে। সিএজি এই প্রতিবেদন অনুমোদন দিয়ে সংসদে

[১১] এই শাখাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

[১২] সিজিএ অফিসের অধীনস্থ স্থানীয় অফিসগুলোর কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন www.cga.gov.bd

পেশ করে। সিজিএ মাসিক হিসাবও তৈরি করে থাকে যা প্রতি মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পাঠানো হয়।

চিত্র ১: হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির ফ্লো চার্ট

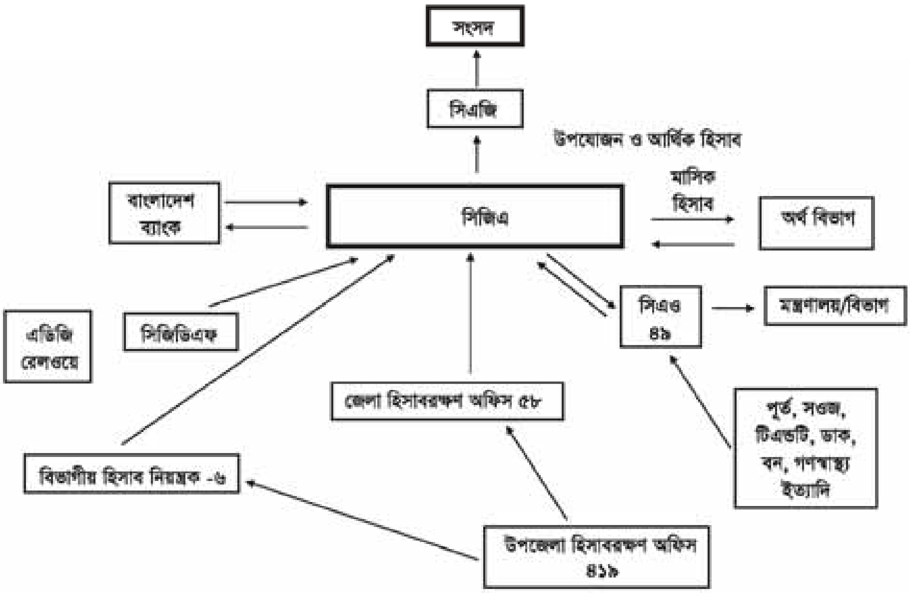

২. হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩. সরকারের বার্ষিক উপযোজন হিসাব ও বার্ষিক আর্থিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য সিএজির নিকট উপস্থাপন।

৪. সিএও'র মাধ্যমে ডিএও'র কাছ থেকে সরকারি হিসাবসমূহ সংগ্রহ করে তা সিএজির কাছে অনুমোদন করানোর জন্য পেশ করা

৫. হিসাবের শুদ্ধতা এবং সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা

৬. সিএজির অনুমতি সাপেক্ষে হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি এবং গঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা

৭. মন্ত্রণালয়/বিভাগের মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার (সচিব) ফাইনান্সিয়াল এডভাইজারের দায়িত্ব পালন।

৮. অর্থ বিভাগের চাহিদানুযায়ী হিসাবের তথ্য সরবরাহ করা

৯. নিরীক্ষাধীন বিভিন্ন দপ্তরের হিসাবের সাথে সিএও অফিসের হিসাবের সঙ্গতিসাধন।

খ. পূর্ব নিরীক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী

১. নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন/ভাতার বিল পাশ, বেতন নির্ধারণ ও ছুটির হিসাব সংরক্ষণ।

২. নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহের সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য খাতের বিল অনুমোদন।

সিজিএ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি ব্যতিত সরকারের কোষাগার হতে অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।[১৩]

৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিপিএফ অগ্রিম/চূড়ান্ত পরিশোধ, বিভিন্ন ঋণ ও অগ্রিম, পেনশন ও আনুতোষিক পরিশোধ।

৪. জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ ইস্যু

৫. গ্রান্টস-ইন-এইড ও প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট ডিসিএ/ডিএও/ইউএও অফিসে প্রেরণ।

৬. মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রাপ্তি এবং অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের বিপরীতে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে মাসিক হিসাব প্রণয়ন

চিত্র ২: বিল পাশ প্রক্রিয়া ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

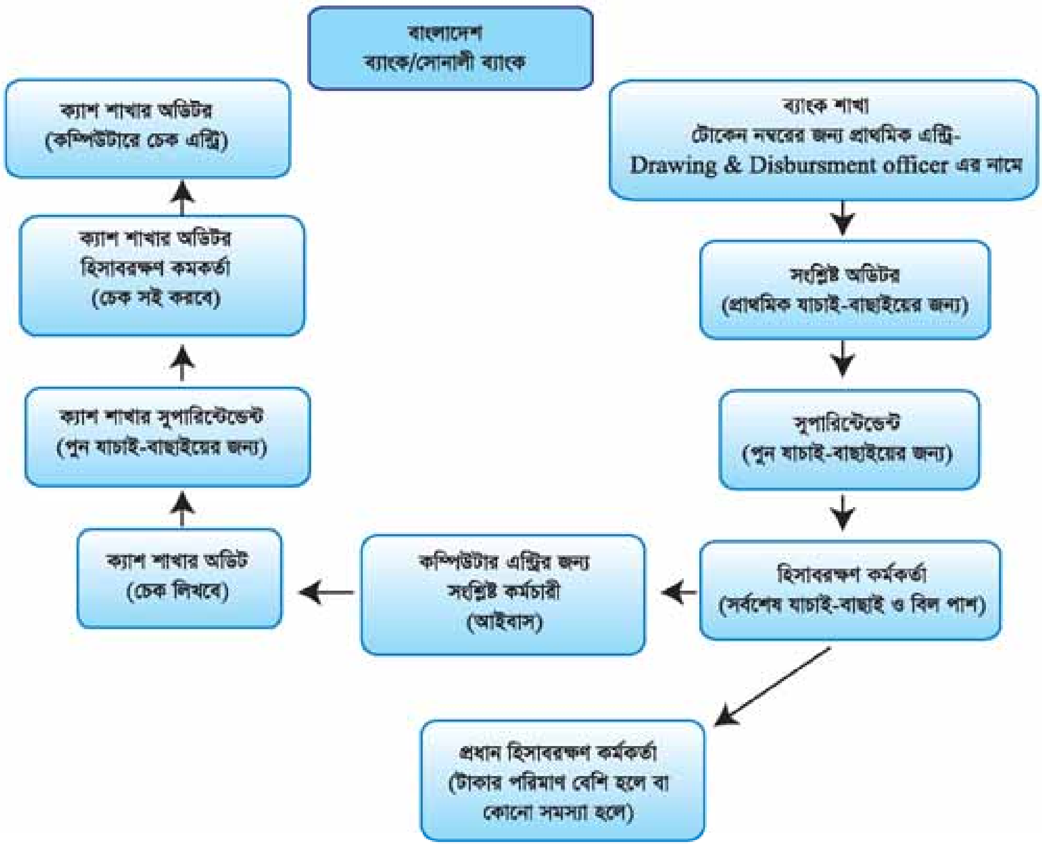

[১৩] ট্রেজারী রুলস, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ. প্রশাসনিক কার্যাবলী

১. হিসাবরক্ষণ অফিসের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা
২. সরকারের হিসাবরক্ষণ ও অর্থ সংক্রান্ত সকল আদেশ, বিধি, আইন এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন করা
৩. অধীনস্থ অফিসের কার্যনির্বাহী নির্দেশনা দেওয়া
৪. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়া
৫. তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভাগীয় বিষয় সম্পর্কিত সমস্যার বিধি মোতাবেক নিস্পত্তিকরণ
৬. অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি এবং পদায়ন দেওয়া
৭. অর্থ মন্ত্রণালয় ও সিএজির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

২.৫ বাজেট

সিজিএ অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের উপর নির্ভর করতে হয়। সিজিএ অফিস তার অধীনস্থ সকল অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করে।

২.৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

সিজিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণত ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (Financial Management Academy - FIMA) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে নিরীক্ষা এবং হিসাব এ দুটি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে সিএজি অথবা সিজিএ এই দুই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ফিমার নিজস্ব ভবন হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাইরে থেকে প্রশিক্ষক আনা হয়। ফিমাতে সার্বক্ষণিক কাজ করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা রয়েছেন। প্রশাসনে কাজ করার জন্য ক্যাডার ও নন-ক্যাডার উভয় ধরনের লোকই কর্মরত আছেন। অডিটরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ফিমার মহা-পরিচালক নিয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ সাধারণত সাত দিন, একুশ দিন কিংবা দুই মাসের হয়ে থাকে। ফিমার প্রশিক্ষণ শেষে কোন প্রফেশনাল মূল্যায়ন বা সনদপত্র দেওয়া হয় না।

ফিমার প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিজিএর কর্মকর্তা-কর্তচারীদের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সম্প্রতি সিএজি কার্যালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রক এবং জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের কম্পিউটার সিস্টেম সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফিন্যান্স মেইলিং সিস্টেম সম্পর্কে পরিচিত করার জন্য 'কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল ও ফিন্যান্স মেইলিং সিস্টেম' এর উপরে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সিজিএ অফিসের ট্রেনিং ল্যাবের মধ্যে আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

২.৭ সিজিএ অফিসের সংস্কারের জন্য গৃহিত প্রকল্প

সরকারি হিসাব প্রক্রিয়া সহজতর ও হালনাগাদ করার জন্য বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে। এই সংস্কার প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালের সংস্কার প্রক্রিয়াটি ১৯৮৯ সালে কমিটি অন রিফর্ম ইন বাজেটিং এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল (Committee on Reform in Budgeting and Expenditure Control -CORBEC)-এর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। ১৯৯৩ সালে কোরবেক প্রতিবেদন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালে রিফর্ম ইন বাজেটিং এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল প্রকল্পটি (Reform in

Budgeting and Expenditure Control Project –RIBEC) যাত্রা শুরু করে। সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যু যেমন বাজেট তৈরির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কার্যকর ছাড়াও রিবেক প্রকল্প নিয়ম-নীতি, কোড, ম্যানুয়াল, সরকারের বাজেট তৈরি ও হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল চার্টের প্রচলন এবং সিজিএ অফিসে সরকারি হিসাব রাখার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে। ২০০২ সালে শেষ হওয়া রিবেক প্রকল্পে তিনটি স্তরে নিম্নের কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছিল:

- ট্রেজারি রুলস, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এবং এ্যাকাউন্ট কোড হালনাগাদ করা।
- সরকারের বাজেট ও হিসাবের ক্ষেত্রে ১৩ ডিজিট সমৃদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ চার্ট প্রচলন, ক্লাসিফিকেশন কোডের আইনগত, প্রায়োগিক, ব্যবহারিক ও আর্থিক দিক ব্যাখ্যা করা।
- Central Data Processing Unit (CDPU)-এর মাধ্যমে সিজিএ-র কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজড করা।
- সিজিএ-তে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি স্থাপন।
- জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস ম্যানুয়াল চালু করা।

রিবেক প্রকল্প শেষ হলে ২০০৩ সালের জুলাই এ সরকারের হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে নিচের উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম প্রোগ্রাম (Financial Management Reform Programme -FMRP) শুরু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের মীমাংসাসহ ট্রেজারি ও ক্যাশ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে উন্নত করা, রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের হিসাব ও রিপোর্ট প্রদান ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা, সকল খরচ খাতে সরকারের হিসাবকে কম্পিউটারাইজড করা। এই প্রকল্পের সময় ছিল জুলাই ২০০৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৯ সাল পর্যন্ত। এফএমআরপি প্রজেক্টের অধীনে নিচের প্রধান প্রধান কার্যাবলী সম্পন্ন হয়:

- সরকারের সকল প্রদান ও হিসাব অফিসের প্রতিদিনের লেনদেন এবং হিসাব সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইন্টিগ্রেটেড বাজেটিং এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (Integrated Budgeting & Accounting System -IBAS) প্রচলন।
- সিজিএ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতিদিনকার হিসাব প্রেরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অফিস, সকল জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষন অফিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network -WAN) ব্যবস্থার প্রচলন।
- সরকারি হিসাবের মানোন্নয়ন।
- ট্রেজারি কার্যক্রম সম্পন্নকারী ব্যাংকগুলো থেকে ডেবিট ও ক্রেডিট স্ক্রল ডাটা আনয়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থার প্রচলন।
- সিজিএর প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা।

২০০৯ সালে এফএমআরপি শেষ হলে ডিপেনিং এমটিবিএফ এন্ড স্ট্রেংদেনিং ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টেবিলিটি (Deepening MTBF & Strengthening Financial Accountability -DMTBF & SFA) প্রজেক্ট আইবাস পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং নভেম্বর ২০০৯ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে সিজিএ-কে হিসাব একত্রিকরণ, ব্যাংক হিসাব মীমাংসাকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল:

- আইটি সুবিধাসহ আইবাস কে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সমর্থন ও সুবিধা দিয়ে যাওয়া।
- ব্যাংক ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রধান হিসাবরক্ষকদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি।
- সিজিএ-র প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা।

২০০৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট -এফএসএমইউ প্রতিষ্ঠা করে। একমাত্র এই প্রকল্পই জনগণের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে এবং প্রাথমিকভাবে এটি অর্থ বিভাগ ও সিজিএ অফিসে কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সহায়তাই নয় বরং দক্ষ জনশক্তি এবং পরামর্শ দিয়েও সহযোগিতা করে। একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে এটি অর্থ ও সম্পদের বিষয়ে কিছুটা সুবিধা ভোগ করে। এই প্রকল্প ৩২ জন কর্মকর্তা, ৮ জন আইটি অফিসার এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কাজের ধরনের ভিত্তিতে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত -হিসাব বিভাগ, বাজেট বিভাগ এবং অবকাঠামো সহায়তা বিভাগ। এই প্রকল্পের প্রধান একজন পরিচালক (অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব, বাজেট) এবং একজন অতিরিক্ত পরিচালক (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট-সিজিএ) দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে সরকার একে একটি স্থায়ী কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবছে।

২.৮ কল্যাণ সমিতি

সিজিএ অফিসে মোট চার ধরনের কল্যাণ সমিতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ১. প্রথম শ্রেণীর (ক্যাডার) কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি, ২. প্রথম শ্রেণীর (নন ক্যাডার) কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি, ৩. তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ও ৪. চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। এই কল্যাণ সমিতিগুলো তাদের পর্যায়ের (লেভেলের) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা, নতুন কোনো সুবিধা দেওয়া, কোনো বিপদে সমর্থন দেওয়া তথা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

২.৯ নাগরিক সনদ

সিজিএ অফিসের কার্যক্রম নিয়ে ২০০৮ সালে একটি নাগরিক সনদ প্রকাশ করা হয়। এই নাগরিক সনদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়:

- সিজিএ অফিসের কার্যাবলী ও প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিতকারী কর্মকর্তার পদবী ও ফোন নম্বর
- প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রধান কার্যাবলী ও প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিতকারী কর্মকর্তার পদবী ও ফোন নম্বর। এছাড়াও কোন সেবা কত দিনের মধ্যে প্রদান করা হবে তা এই নাগরিক সনদে উল্লেখ রয়েছে।

২.১০ ওয়েবসাইট

সম্প্রতি সিজিএ'র ওয়েবসাইটটি চালু করা হয়েছে। পূর্বে এর কোনো ওয়েবসাইট ছিল না। গত ৩০ জুন, ২০১০ বুধবার অর্থ সচিব, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকসহ অডিট ও হিসাব শাখার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সিজিএর ওয়েবসাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। উক্ত ওয়েবসাইটে সিজিএর কাজের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্গানোগ্রাম, যোগাযোগের তথ্য, সিজিএ ও এজিদের প্রোফাইল, সিটিজেন চার্টার, সংস্কার কার্যক্রম, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ ও বিজ্ঞপ্তি, ২০০৯ এর জাতীয় পে স্কেল, আর্থিক প্রতিবেদন ও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

সিজিএ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের আইন, বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষায় স্বচ্ছতা, জনবলের সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধার যথাযথ ব্যবহার সর্বোপরি সেবাগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি অর্জন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সিজিএ যেসব আইন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেসব আইন-কানুন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিভিন্ন রকমের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা অনেক সময় সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কোন্ কোন্ প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত দুর্বলতার জন্য সিজিএ অফিস সরকারি অফিসগুলোকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের হিসাবরক্ষণ এখনও ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী চলছে। ব্রিটিশ আমলের ট্রেজারি কোড, এ্যাকাউন্টস কোডের বিভিন্ন ভলিউম অনুযায়ী সিএজি ও সিজিএ অফিসের কার্যক্রম চলছে ও হিসাবরক্ষণ করা হচ্ছে। সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় হিসাব রক্ষিত হত। বর্তমান বাংলাদেশেও একই নিয়মের মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, সে সময়ে যে নিয়মে যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা, বাসা ভাড়া, কন্টিজেন্সি বিল দেওয়া হত সে নিয়মই এখনও পালন করা হচ্ছে যা বাস্তবসম্মত না হওয়ায় পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বর্তমান অবস্থায় পূর্বের নিয়ম মানতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ২০০৯ সালে নতুন পে স্কেল দেওয়া হলেও যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা, কন্টিজেন্সি বিলের পরিমাণের ক্ষেত্রে কোনো পুনর্বিবেচনা করা হয়নি। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সবকিছুরই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এসব রুলস এন্ড রেগুলেশন্স ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হলেও অনেক জায়গায় এখনও পূর্ব পাকিস্তান লেখা আছে।

পূর্বে সরকারি কর্মকর্তাদের তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। এগুলো হলো ক্যাটাগরি এক যারা আঞ্চলিক বা বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত, ক্যাটাগরি দুই যারা জেলা পর্যায়ে কর্মরত এবং ক্যাটাগরি তিন যারা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত থাকবেন। কিন্তু অনেক জেলাই বিভাগীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং জেলা পর্যায়ের সদর উপজেলাও একটি উপজেলা। এসব বিভাগীয় শহর বা জেলা সদর উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তারা কোন ক্যাটাগরিতে সুযোগ-সুবিধা পাবে তা প্রশাসন পরিষ্কার না করায় এসব কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে কখনও কখনও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাবার যোগ্য তার থেকে বেশি বা কম পায় কিংবা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়।

কোড অব একাউন্টস্ এর প্রয়োজনীয় সংস্কার অনুপস্থিত

সিজিএ'র বর্তমান অটোমেশন প্রক্রিয়ার কার্যক্রমের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় রেখে কোড অব একাউন্টস এর কোনো প্রকার সংস্কার সাধন করা হয়নি। সিজিএ অফিসের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারে অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় করা হলেও এখনও পুরোনো ম্যানুয়্যাল ভিত্তিক কোড অব একাউন্টস্ অনুসরণ করতে হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য পেন-ড্রাইভ বা ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। কিন্তু কোড অব একাউন্টস্ এ বলা আছে চালান বা অন্যান্য ডকুমেন্ট ডাকযোগে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ অটোমেশন করার পর অটোমেশন পদ্ধতিতে কিভাবে কাজ করতে হবে তা ম্যানুয়্যালে নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

সিজিএ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের আইন, বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষায় স্বচ্ছতা, জনবলের সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধার যথাযথ ব্যবহার সর্বোপরি সেবাগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি অর্জন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সিজিএ যেসব আইন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেসব আইন-কানুন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিভিন্ন রকমের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা অনেক সময় সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কোন্ কোন্ প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত দুর্বলতার জন্য সিজিএ অফিস সরকারি অফিসগুলোকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের হিসাবরক্ষণ এখনও ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী চলছে। ব্রিটিশ আমলের ট্রেজারি কোড, এ্যাকাউন্টস কোডের বিভিন্ন ভলিউম অনুযায়ী সিএজি ও সিজিএ অফিসের কার্যক্রম চলছে ও হিসাবরক্ষণ করা হচ্ছে। সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় হিসাব রক্ষিত হত। বর্তমান বাংলাদেশেও একই নিয়মের মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, সে সময়ে যে নিয়মে যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা, বাসা ভাড়া, কন্টিজেন্সি বিল দেওয়া হত সে নিয়মই এখনও পালন করা হচ্ছে যা বাস্তবসম্মত না হওয়ায় পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বর্তমান অবস্থায় পূর্বের নিয়ম মানতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ২০০৯ সালে নতুন পে স্কেল দেওয়া হলেও যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা, কন্টিজেন্সি বিলের পরিমাণের ক্ষেত্রে কোনো পুনর্বিবেচনা করা হয়নি। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সবকিছুরই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এসব রুলস এন্ড রেগুলেশন্স ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হলেও অনেক জায়গায় এখনও পূর্ব পাকিস্তান লেখা আছে।

পূর্বে সরকারি কর্মকর্তাদের তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। এগুলো হলো ক্যাটাগরি এক যারা আঞ্চলিক বা বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত, ক্যাটাগরি দুই যারা জেলা পর্যায়ে কর্মরত এবং ক্যাটাগরি তিন যারা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত থাকবেন। কিন্তু অনেক জেলাই বিভাগীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং জেলা পর্যায়ের সদর উপজেলাও একটি উপজেলা। এসব বিভাগীয় শহর বা জেলা সদর উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তারা কোন ক্যাটাগরিতে সুযোগ-সুবিধা পাবে তা প্রশাসন পরিষ্কার না করায় এসব কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে কখনও কখনও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাবার যোগ্য তার থেকে বেশি বা কম পায় কিংবা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়।

কোড অব একাউন্টস্ এর প্রয়োজনীয় সংস্কার অনুপস্থিত

সিজিএ'র বর্তমান অটোমেশন প্রক্রিয়ার কার্যক্রমের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় রেখে কোড অব একাউন্টস এর কোনো প্রকার সংস্কার সাধন করা হয়নি। সিজিএ অফিসের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারে অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় করা হলেও এখনও পুরোনো ম্যানুয়্যাল ভিত্তিক কোড অব একাউন্টস্ অনুসরণ করতে হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য পেন-ড্রাইভ বা ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। কিন্তু কোড অব একাউন্টস্ এ বলা আছে চালান বা অন্যান্য ডকুমেন্ট ডাকযোগে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ অটোমেশন করার পর অটোমেশন পদ্ধতিতে কিভাবে কাজ করতে হবে তা ম্যানুয়্যালে নেই।

অন্যদিকে এই একাউন্ট কোড হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রয়েছে। একাউন্ট কোড হালনাগাদ করতে হলে বর্তমান অটোমেটেড ব্যবস্থায় কার্যকর কোড ব্যবহার করার কথা ভাবতে হবে। এই হালনাগাদ করার জন্য সিএজির অনুমোদন প্রয়োজন। কারণ সংবিধানে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের হিসাব কিভাবে রাখা হবে তা সিএজি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে ঠিক করবে। সংস্কারকৃত একাউন্ট কোডের উপরে মন্তব্যের জন্য সিএজি'র নিকট তা পাঠাতে হবে। সিএজি তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাবে। রাষ্ট্রপতি তা দক্ষতা সম্পন্ন কোনো সচিবের মাধ্যমে মূল্যায়ন করাবেন। উক্ত সচিব যদি তাতে কোনো আপত্তি তোলে তবে রাষ্ট্রপতি তা নাকচ করে দিবে এবং এই একাউন্ট কোড হালনাগাদ হবে না।

ফান্ডামেন্টাল রুল (তৎকালীন এফআর) এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (তৎকালীন ইবিএফআর) হালনাগাদ না করা

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাগণের জন্য ফান্ডামেন্টাল রুল (১৯৫৫) এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তাদের জন্য ইস্ট পাকিস্তান ফান্ডামেন্টাল রুল (১৯৫৯) (বর্তমানে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস) কার্যকর ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর যেহেতু এদেশে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার বলে আলাদা কিছু নেই, তাই কার জন্য কোন আইন প্রযোজ্য হবে কর্মকর্তাগণ তা নিয়ে বিপাকে পড়েন। এ সমস্যার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি '৭২ সালে ঘোষণা দেন যে, যে কর্মকর্তা যে আইনের আওতায় চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছেন তার জন্য সে আইনই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পাকিস্তানে কর্মরত ছিল তারা এফআর এবং যারা বাংলাদেশে কর্মরত ছিল তারা বিএসআর এর নিয়ম অনুসারে সুযোগ সুবিধা পাবে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের যেসব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত সেসব প্রতিষ্ঠান বিএসআর এর মাধ্যমে পরিচালিত না হয়ে এফআর এর মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ দুটি আলাদা আলাদা আইনের প্রয়োজীয়তা না থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার এত বছর পরও এ দুটি আলাদা আইন একত্রিত করা হয়নি বা হালনাগাদ করা হয়নি।

অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পাশকৃত আইনসমূহ বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। ফলে সকল আইন কোনো কর্মকর্তার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সরকারি কর্মকর্তাগণ তাদের জানা আইন অনুযায়ী কোনো কিছু দাবি করলে সিজিএ কর্মকর্তাগণ তা দিতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ ওই কর্মকর্তার জানা আইনের পরও যে কয়েকটি আইন সংশোধন হয়েছে তা তার জানা নেই। একই সাথে সিজিএ কর্মকর্তাগণের পক্ষেও সব মনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো সিজিএ কর্মকর্তা আবার এই নানাবিধ আইনের মধ্যে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী একেক সময় একেক রকম আইন অনুসরণ করছে। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে এবং তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ।

আইনের ব্যাখ্যাগুলো সহজবোধ্য নয়

আইনের ব্যাখ্যাগুলো সহজবোধ্য না হওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করে। এতে আইন অনুযায়ী অনেকেই তাদের কাঙ্ক্ষিত পাওনাগুলো ভোগ করতে পারে না।

বক্স ১: আইনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখার কারণে ভোগান্তি

প্রায় ১০ বছর আগে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা আইন অনুযায়ী কোনো একটি কিছু দাবী করেন। এ বিষয়ে সিজিএ'র শাখা অফিস মনে করে যে, তার এ দাবীটি আইন অনুযায়ী যৌক্তিক এবং তা তিনি পাওয়ার অধিকার রাখেন। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মনে করেন আইন অনুযায়ী এ দাবীটি যৌক্তিক নয়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের নিকট দাবীটি উপস্থাপন করেও কোনো লাভ হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ট্রাইব্যুনাল এ যান এবং বহু বছর পর সে দাবীর প্রেক্ষিতে তার প্রাপ্তি অর্জন সম্ভব হয়।

সরকারের সাব ডেলিগেশন ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার (Sub Deligation Financial Power) অর্থ মন্ত্রণালয় ইস্যু করে। কিন্তু সরকারের এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি রয়েছে, যার মাধ্যমে সেসব প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তাদের হিসাবরক্ষণ করছে। সরকার থেকেই ওইসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। কোন নিয়মগুলো (নিজস্ব নিয়ম নাকি সরকারের সাধারণ নিয়ম) এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হবে অর্থ মন্ত্রণালয় তা হালনাগাদ করছে না। ফলে সরকারিভাবে অডিট টিম ওই সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম না মেনে আপত্তি উত্থাপন করছে। যেমন রেলওয়ের নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে। সরকার তা বাতিল না করেই সরকারের অন্যান্য সাধারণ নিয়ম-কানুন রেলওয়েতে কার্যকর করার জন্য বলছে। ফলে এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে অডিট আপত্তি মিটছে না এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে।

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলের মাধ্যমে সরকারের ট্রেজারি রুল পালন করা হত যা বর্তমানে কার্যকর নয়। অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের নির্বাহী ক্ষমতা দ্বারা তা বাতিল করেছে। কিন্তু তারা জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলকে হালনাগাদ করছে না। ফলে হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন সংবিধান অনুসারে সরকারি আর্থিক নিয়মের ব্যাখ্যা সিএজির দেওয়ার কথা থাকলেও তা অর্থ মন্ত্রণালয় দিচ্ছে। আবার অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের নির্বাহী ক্ষমতাবলে এক এক সময় এক এক নিয়ম তৈরি করছে। হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে সিজিএ অফিসগুলো কখনও সিএজি'র নিয়ম কখনও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ম মেনে চলছে এবং অডিটে আপত্তি তুলে ধরে হয়রানি করছে। ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৩.২.১ প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব

জনবল সমস্যা সিজিএ অফিসের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সিজিএ কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলাসহ সকল পর্যায়ে এই জনবল স্বল্পতা রয়েছে। বর্তমানে সিজিএ অফিসে ৩৭% পদ শূন্য রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে ৬৯৫টি কিন্তু কর্মরত আছে ৬৫৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে ৭৮২টি কিন্তু কর্মরত আছে ২২৫ জন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মোট ৪০.২৮% পদ শূন্য রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মোট মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৬২৫৩টি আর কর্মরত আছে ৪০০০ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে ৩৬%।[১৪]

চিত্র ৩: কর্মরত জনবল ও শূন্য পদের শতকরা হার

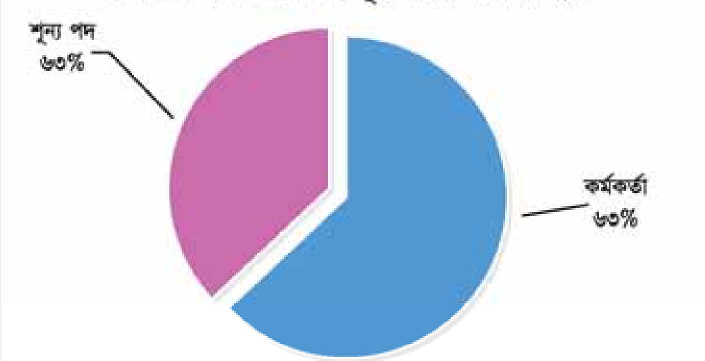

---

[১৪] জনবল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ৩ দেখুন

আবার বিভাগীয় ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জনবলের সংকট আরো প্রকট। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অফিসের মত মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কোনো আলাদা অফিস নাই। জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে সাধারণত ২০ থেকে ২৫ জন লোক কাজ করে। এখানে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, এক থেকে দুই জন সুপার, ১০ থেকে ১২ জন অডিটর, চার থেকে পাঁচ জন জুনিয়র অডিটর ও এক থেকে দুই জন এমএলএসএস কাজ করে। কোনো কোনো অফিসে লোকবল স্বল্পতার কারণে ঢাকা অফিস থেকে প্রেষণে লোক নিয়ে কাজ করানো হয়।

উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোতে সাধারণত ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২-৩ জন অডিটর, ১ জন জুনিয়র অডিটর, একজন এমএলএসএস থাকে। এখানে বিল পাস করার একমাত্র ক্ষমতা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার। কোনো কোনো অফিসে মাত্র ১ জন অডিটর থাকে। তারা আবার বিভিন্ন সময় তদবির করে ঢাকায় চলে আসে। উপজেলা-জেলা পর্যায়ে কাজ করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকায় কর্মরত সুপারিটেন্ডেন্ট ও অডিটরদের প্রেষণে পাঠানো হয়। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলায় প্রায় ৩৪.৫২% পদ শূন্য।

বিভিন্ন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সেখানে জনবলের অভাবে সরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সিজিএ অফিসের কাজ নিজেরাই করছে। তারা সিজিএ অফিসের রেজিস্ট্রার খুঁজছে, সেখানে এন্ট্রি দিচ্ছে এমনকি কম্পিউটারেও এন্ট্রি দিচ্ছে। অডিটরদের আসনে বসে কাজ করছে সরকারি অফিসের কর্মচারীরা। এর ফলে অনেক সময় সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। ভুল বা মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নিতে সক্ষম হচ্ছে সরকারি অফিসের এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। আবার ভুল বা মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করার কারণে হিসাবে গড়মিল তৈরি হচ্ছে, যা যাচাই করে দেখার মত যথেষ্ট জনবল এখানে নেই। উদাহরণ হিসেবে সিএও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তুলে ধরা যায়। প্রতি বছরই এ মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সিএও স্বরাষ্ট্র অফিসের জনবল সেভাবে বাড়ছে না। মার্চ ২০১১ তারিখ অনুসারে এখানে মোট ৪০,৮৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কর্মরত রয়েছে মাত্র ৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। এই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রয়েছে মাত্র ৬ জন কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর রয়েছে মাত্র ৮ জন কর্মকর্তা। অন্যান্যদের মধ্যে অডিটর ৩১ জন এবং জুনিয়র অডিটর ১১ জন ও ২ জন টাইপিস্ট যারা মূলত এই অফিসের কাজগুলো সম্পন্ন করে। বাকি সব কর্মচারীরা এদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে এ অফিসে মোট ৬৫৫৬টি বিল জমা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৬২৯৫টি বিল পাস এবং ইস্যু করা হয়। পাসকৃত বিলের মধ্যে বেতন বিল ছিল ৩১০০টি, অন্যান্য বিল ৩১৯৫টি এবং আপত্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মোট বিল ছিল ৪৪টি। পাসকৃত বিল ছাড়া বাকি ২৬১টি বিল এ অফিস থেকে আপত্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসে ফেরত পাঠানো হয়।

অন্যদিকে প্রতি বছরই সরকারি বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বাজেটের সাথে বাড়ছে বিলের সংখ্যাও। অথচ এই বিল বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সিজিএ অফিসের জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপরে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিটি কেইস, ফাইল, বিল আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল সিজিএ'র নেই। তাই সিজিএ'র কার্যক্রম দক্ষভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে সিজিএ অফিসের হিসাব সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। জেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল অফিসে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে আইবাস -এর মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু এই অটোমেশন প্রক্রিয়ায় কাজ পরিচালনার জন্য কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন যথেষ্ট লোক সিজিএ'তে নেই। সিজিএ অফিসে তেরো ডিজিটের একটি কোডের মাধ্যমে সব হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটি অফিসের জন্য পৃথক পৃথক কোড রয়েছে। কিন্তু এই ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিল পাসের ক্ষেত্রে কোনো অফিসের কোড নম্বর যদি অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করা প্রয়োজন। এই

কোড নম্বর এন্ট্রিতে ভুল হলে একটি সংস্থার টাকা অন্যটিতে এন্ট্রি হবে। এসব কাজ পরিচালনার মত দক্ষ লোক এখানে নেই। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না, হিসাবে ত্রুটির সৃষ্টি হয়।

৩.২.২ হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব

আর্থিক বিবরণী বা হিসাব প্রতিবেদন হওয়া উচিত সময় মাফিক যা হবে সকলের বোধগম্য, প্রাসঙ্গিক, বস্তুগত, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, প্রতিনিধিত্বশীল, সংক্ষিপ্ত, নিরপেক্ষ, দূরদর্শী, পূর্ণাঙ্গ এবং তুলনীয়।[১৫] কিন্তু সিজিএ অফিস যে হিসাব বিবরণী তৈরি করে তা করার ক্ষেত্রে প্রায়ই গড়মিল দেখা দেয়। সরকারের বিভিন্ন উৎস যেমন রাজস্ব, কর, শুল্ক ইত্যাদি থেকে অর্থ সঠিকভাবে আসল কিনা বা সরকারের এই অর্থ যেভাবে ব্যয় হচ্ছে তা সঠিকভাবে হল কিনা তার হিসাব মিলানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই হিসাবের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের বাজেট তৈরি করা হয়। কিন্তু এই কাজটি সিজিএ অফিস প্রায়ই সঠিকভাবে করে না। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হিসাবরক্ষণের চেয়ে বিল পাশ করার প্রতি বেশি আগ্রহী। যেকোনো হিসাবের বিশেষ করে উন্নয়ন বাজেটের টাকার হিসাব মেলানো না গেলেই তা অমীমাংসিত টাকা হিসেবে দেখানো হয়। এই অমীমাংসীত টাকার পরিমাণ কম (৩০-৪০ কোটি) হলে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়না। কিন্তু এই টাকার পরিমাণ ১০০ কোটি বা তার বেশি হলে, অর্থ মন্ত্রণালয় সিজিএকে অবশ্যই হিসাব মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বলে। সিজিএ অফিস তখন কোনো রকম গোঁজামিল দিয়ে হিসাব মিলিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে এই অমিমাংসিত টাকা অমিমাংসিতই থেকে যায়। ফলে এই প্রতিবেদনে কখনই সরকারের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়নি।

অনেক সময় সিজিএ অফিসের বিল এন্ট্রি করতে ভুল হওয়ার জন্য হিসাবের গড়মিল দেখা যায়। তথ্যের শ্রেণীকরণে ত্রুটির (Misclassification) কারণে কেউ যদি ভুল করে ডাটা সংশ্লিষ্ট কোডে না এন্ট্রি করে অন্য কোনো কোডে অন্তর্ভুক্ত করে তবে তাতে স্বাভাবিকভাবেই হিসাবের গড়মিল দেখা দেয়। ডাটা এন্ট্রি দেখে এ ভুল বোঝা সম্ভব নয়, যদি সংশ্লিষ্ট বিভাগ তা ধরিয়ে না দেয়। এ জটিলতা দূর করার জন্য প্রতি মাসের হিসাব নিয়ে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও হিসাবরক্ষণ অফিসের সাথে সমঝোতা করার নিয়ম রয়েছে। যদি তা না করা হয় তবে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা যে রিপোর্ট দিবে সেটাই চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া হবে। কিন্তু হিসাবরক্ষণ অফিসসমূহের অনীহার কারণে তা সম্ভব হয় না। এতে সমস্যার সমাধানও হয়না।

সাধারণত সরকার থেকে বরাদ্দকৃত বাজেট সকল প্রক্রিয়া শেষ করে বিভিন্ন অফিস ঘুরে সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছাতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস সময় চলে যায়। তখন পরবর্তী জুনের মধ্যে সকল অর্থ খরচ করা সম্ভব হয় না। এজন্য তাড়াহুড়ো করে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়। কারণ অফিসগুলোর মধ্যে ভয় থাকে যে যদি বরাদ্দকৃত বাজেট খরচ না হয় তাহলে তা ফেরৎ চলে যাবে এবং খরচ করতে না পারার কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ সময়ে সিজিএ অফিস থেকে দ্রুত বিল পাস করাতে গিয়ে কম্পিউটারে এন্ট্রি ও বিল চেক করতে অনেক ভুল করে থাকে। ফলে অনেক সময় হিসাবের গড়মিল দেখা যায়।

অনেক সময় সিজিএ অফিস থেকে যত টাকার চেক বাংলাদেশ ব্যাংকে যায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যত টাকা ক্যাশ হিসেবে দেওয়া হয় তার সম্পূর্ণ হিসাব পরবর্তীতে মেলানো হলে হিসাবে বড় অংকের গড়মিল দেখা দেয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত অর্থ ও সিজিএ'র হিসাবের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। সাবেক একজন সিএজি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলেন তার সময়ে কোনো অর্থ বছরেই এই দুই হিসাবের মধ্যে মিল পাওয়া যায় নাই।

---

[১৫] K. P. Kaushik, Chartered Accountant, Government Accounting: Recent trends and direction for Idia, January 2006, website: icai.org/resource_file/103251018-1029.pdf, March 2011

ট্রেজারী রুল অনুযায়ী যে যত বিল জমা দেবে তাকে সিজিএ থেকে সে পরিমাণ অর্থেরই চেক প্রদান করতে হবে। কারো বিল যদি রাউন্ড ফিগার না (যেমন ১৬৫.৭৯ টাকা) হয়, সেক্ষেত্রে খুচরা পয়সাকে রাউন্ড ফিগার করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিল দেয়া হয়। ফলে সিজিএ অফিসের হিসাবের সাথে বাংলাদেশ ব্যংকের হিসাবে গড়মিল তৈরী হয়।

আবার প্রকল্পের কাজে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সভাগুলোতে প্রকল্প পরিচালকগণ প্রধানমন্ত্রীকে খুশী করার জন্য মন্ত্রণালয়ের খরচ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে। উন্নয়ন না হলেও উন্নয়ন হয়েছে বলে উপস্থাপন করে। অর্থ ব্যয় না হলেও অবৈধভাবে তারা ব্যয় দেখায়। মন্ত্রীরা এই ব্যয় এবং উন্নয়নের চিত্র প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করে। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের হিসাব ও সিজিএর হিসাবে একটি অমিল দেখা যায়।

এনবিআর থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে সিজিএতে যে প্রতিবেদন দেওয়া হয় সেখানে সরকার পে অর্ডারের মাধ্যমে যে অর্থ গ্রহণ করে সেগুলোও উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় পে অর্ডারসহ সরকারি কোষাগারে এই পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এনবিআর এর দেখানো অর্থের পরিমাণ সিজিএ সরকারের কোষাগারে জমাকৃত পায় না। কারণ সরকার যে পরিমান পে অর্ডার পায় তা ক্যাশ না করা পর্যন্ত টাকা সরকারের কোষাগারে জমা হয় না। আর সরকারের এত পরিমান পে-অর্ডার ক্যাশ করানোর মত যথেষ্ট জনবলের অভাব রয়েছে বিধায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৬ মাস পর্যন্ত পে অর্ডার বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক এ জমা পড়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বহু কোটি টাকা আর্থিক ভাবে লাভবান হয় কিন্তু সরকার তা থেকে বঞ্চিত হয়। আর এভাবে সিজিএর সাথে অন্যান্যদের তথ্যের গড়মিল তৈরী হয়।

ডিফেন্স, রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের মত যেসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বাজেটের অর্থ সিজিএর মাধ্যমে ব্যয় হয় না, সেসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সিজিএ কার্যালয়ে পাঠানোর পরে তা ইনপুট দিতে হয়। এই তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে এনে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে হিসাব তৈরী করা হয়। অনেক সময় চূড়ান্ত হিসাব করার সময়ে ঐসকল প্রতিষ্ঠানের হিসাবের সাথে সিজিএর তথ্যে গড়মিল পাওয়া যায়।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগগুলোর কোনো হিসাব সিজিএতে আসে না। এই বিনিয়োগের হিসাবের ক্ষেত্রে কোনো মতে ডেবিড-ক্রেডিট মিলিয়ে একটি হিসাব তৈরী করে দেয়া হয়। ফলে হিসাবের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৩.২.৩ সময়মত হিসাবের প্রতিবেদন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ

সিজিএ অফিসের হিসাবের প্রতিবেদন সময় মতো তৈরি করার উপরে নির্ভর করে সরকারের পরবর্তী বছরের সফল বাজেট প্রণয়ন। সিজিএ অফিস থেকে প্রতি অর্থ বছরের উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিএজি বরাবর পাঠানোর নিয়ম রয়েছে। এরপরে সিএজির পক্ষ থেকে সিভিল অডিট বিভাগ কর্তৃক তা পরীক্ষা করা, ভুল ত্রুটি সংশোধন করা ও সিএজি'র মন্তব্য দেয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী বছরের ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে এই সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে এই হিসাবে বিবরণ বাজেট তৈরিতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। যে সকল উল্লেখযোগ্য কারণে প্রতিবেদন তৈরীতে দেরী হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা

সিজিএ হিসাব প্রতিবেদন অডিট এর জন্য সিভিল অডিট অধিদপ্তরে পাঠায়। সিভিল অডিট অধিদপ্তর অডিটর জেনারেল এর পক্ষে তার অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে। অডিট শেষে সিভিল অডিট এ হিসাব প্রতিবেদনের

ওপর প্রত্যয়ন বা মন্তব্য প্রদান করে। সিভিল অডিট এর আপত্তি বা মন্তব্যসমূহ সিএজি'র নিকট প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো ভুল হলে তা পরিবর্তন করা হয়। আর সিজিএ'র হিসাবে কোনো ভুল না হয়েও যদি অডিট আপত্তি উঠে সেক্ষেত্রে সিএজি তা সংসদে পাঠায়। কখনও কখনও সংসদ তা নিয়ে আলোচনা করে, কখনও কখনও করে না। যখন এই অডিট আপত্তি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হয়, তখন অডিট আপত্তিসহই দিনের পর দিন এই প্রতিবেদন সংসদে আলোচনাবিহীন পড়ে থাকে। ফলে প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হয় না। সিজিএর কোনো এখতিয়ার নেই সিভিল অডিট এর আপত্তির ওপর হাত দেয়া বা সিএজি'র মন্তব্যসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

বক্স ২: পূর্ব বছরের হিসাবের সমস্যার কারণে হিসাবের প্রতিবেদন তৈরিতে দেরি

বহু বছর আগে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে। বছরের পর বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ঋণের দায় বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় সরকার তার বন্ড ভাঙিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে ঋণ মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এখন বন্ড ভাঙানোর ফলে ডকুমেন্ট বলে সরকারের তহবিলে টাকা আসছে। কিন্তু সেই টাকা কোথায় ও কিভাবে ব্যয় হলো তার কোনো তথ্য বা দলিল থাকে না। কারণ ২০ বছর আগে ঋণ করে টাকা ব্যয় করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কোনো ভাউচর সংগ্রহ করেনি। এতে করে কোন খাতে টাকা গুলো ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কিত কোনো দলিল বা প্রমাণ পাওয়াও সম্ভব হয়না। এমতাবস্থায় সরকার তার বন্ড বিক্রি করে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ঋণ পরিশোধ করলে সরকারের ব্যয়িত সে টাকার কোনো হিসাব থাকে না। আর এত বছর আগে ব্যয় করা টাকার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। এ ব্যয় নিয়ে অডিট আপত্তি তুললে সিজিএ উক্ত ব্যাখ্যাটি তাদের প্রদান করে। এ সকল বাস্তবতা তুলে ধরা সত্ত্বেও অডিট সে ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়না। এ প্রেক্ষিতে হিসাবের প্রতিবেদনটি পড়ে থাকে। যার ফলে প্রতিবেদন প্রকাশ বিলম্বিত হয়।

গুণগত মান বজায় রাখতে অধিক সময় গ্রহণ

কোনো কারণে কোনো বিল নিয়ে সমস্যা হলে প্রতিবেদনের গুনগত মান বজায় রাখতে সময় নিয়ে সমস্যাটি সমাধান করে হিসাব প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, ২ কোটি টাকার কোনো একটি বিদেশী ঋণ হয়তো ১৯৭২ সালে গ্রহণ করা হয়েছে যার বর্তমান মূল্যমান হয়েছে ২২ কোটি টাকা। সিভিল অডিট এ ব্যপারে পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্য বিনিময় হার প্রদান করতে বলে। কিন্তু এ বিনিময় হার জানার জন্যে সিজিএকে ইকনোমিক রিলেশন্স ডিভিশন (ইআরডি) এর সাথে যোগাযোগ করে জেনে প্রতিবেদনে তা ব্যাখ্যা হিসেবে সংযুক্ত করতে হয়। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা দানের জন্য প্রতিবেদন তৈরী বিলম্বিত হয়।

সিভিল অডিট বিভাগ কোনো তথ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হওয়া

প্রতিবেদন তৈরীতে দেরির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে সিজিএ অফিস এবং সিভিল অডিট বিভাগের একমত না হওয়া। কোনো বিষয়ে সিভিল অডিট যদি আপত্তি তুলে সিজিএর নিকট তার ব্যাখ্যা চায় এবং সিজিএ সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করে অডিটকে সন্তুষ্ট করতে না পারে তবে সে প্রতিবেদন প্রকাশ বিলম্বিত হয়। সিজিএ ব্যাখ্যাটা ঠিক হিসেবে মনে করলেও অডিট তাতে সন্তুষ্ট না হলে প্রতিবেদন ঐ অবস্থাতেই পড়ে থাকে।

প্রতিবেদন প্রকাশের নির্ধারিত সময়ের পর হিসাবের ভুল ত্রুটি নিরুপন

সারা দেশে ৩০ জুন হিসাব বন্ধ হয়ে যায় এবং হিসাব কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। হিসাব পরীক্ষাকালে যদি কোনো ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে তবে তা সংশোধন করার জন্য আবার সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠানো হয়। সেক্ষেত্রে সময় নিয়ে তা সংশোধন করতে হয় বিধায় প্রতিবেদন তৈরিতে দেরি হয়ে যায়। ভুল সংশোধন করতে যত বেশি সময় দরকার হয় প্রতিবেদন তৈরিও তত বেশি পিছিয়ে যায়। যদিও পরবর্তী মাসের ১৫

দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসের হিসাব সমন্বয় করার নিয়ম রয়েছে। হিসাবরক্ষণ অফিস এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না।

প্রতিমাসে হিসাব করে ভুলগুলো চিহ্নিত না করা

কেন্দ্রীয়ভাবে মন্ত্রণালয় অনুসারে প্রতিটি সিএও'র দায়িত্ব হলো প্রতিটি (৪১৩টি) উপজেলা অফিসের প্রতি মাসের হিসাব পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু সিএও অফিসগুলো তাদের সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না। সিএও অফিসগুলো বিল পাশের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আয় করার সুযোগ থাকায় হিসাব রক্ষণের তুলনায় বিল পাশের প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। ফলে বছর শেষে যখন হিসাব মিলানো হয় তখন একসাথে উপজেলা অফিসগুলোর সাথে সমন্বয় করা হয় এবং ভুল-ত্রুটিগুলো ধরা পরে। ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে হিসাব পুনরায় যাচাই করে তা সঠিকভাবে সিএও অফিসে পাঠাতে অনেক সময় লাগে। এজন্য প্রতিবেদন তৈরীতেও দেরী হয়।

বিদেশী মিশনগুলোর হিসাব সময়মত না আসা

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনগুলো থেকে অর্থ ব্যয়ের হিসাব সময়মত আসে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বিভাগীয় সব হিসাব সিজিএ হিসাব বিভাগে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবেদন তৈরী করা সম্ভব হয়না।

বিজি প্রেস এর সিডিউল না পাওয়া

প্রতিবেদন ছাপানোর জন্য অনেক সময় বিজি প্রেস এর সিডিউল পেতে দেরি হয়। ফলে প্রতিবেদন প্রকাশও দেরি হয়।

৩.২.৪ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অর্গানোগ্রামে সমস্যা

নিজস্ব নিয়োগ বিধি না থাকা

সিএজি এবং সিজিএ-র বিভাজন ২০০২ সালে ঘটলেও এখন পর্যন্ত সিজিএ-র নিজস্ব কোন নিয়োগবিধি নাই। নিয়োগ, পদোন্নতি, পদাধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি বিষয়ে নিজস্ব কোনো বিধিমালা নাই। সিজিএ'র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদায়ন সিএজির মাধ্যমেই হয়। সিজিএ কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। নিজস্ব নিয়োগ বিধি না থাকায় সরকারি নিয়ম অনুসরণ করে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে যেখানে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে কোনো শর্ত দিতে পারছে না। ফলে সিজিএ অফিসে প্রয়োজন থাকা স্বত্তেও বাণিজ্যিক বা কম্পিউটার বিজ্ঞান থেকে পাসকৃত লোকবল নিয়োগ করতে পারছে না। ফলে সময়মত ও নির্ভুলভাবে কাজ সম্পন্ন সম্ভব হচ্ছে না।

পূর্বে এজি-সিভিল, এজি-ওয়ার্কস্ (পূর্ত), এজি পররাষ্ট্র, এজি পিটিএন্ডটি বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগ বিধি ছিল। এজি পিটিএন্ডটি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল ৫০% সরাসরি নিয়োগ হবে এবং ৫০% পদোন্নতি দেওয়া হবে। আর এজি সিভিল নিয়োগের ক্ষেত্রে ৭০% সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে এবং ৩০% পদোন্নতি দেওয়া হবে। বর্তমানে এজি পিটিএন্ডটিসহ অন্যান্য সকল সেকশন এক হলেও নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন নিয়ম পালন করা হবে (শতকরা কত হারে করা হবে) সে বিষয়ে নতুন কোনো নীতিমালা তৈরী করা হয়নি। পূর্বের এজি-সিভিল এর নিয়মটিই সিজিএর (৭০% নিয়োগ ও ৩০% পদোন্নতি) নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কার্যকর রয়েছে। এ নিয়মটি সংস্কার করার জন্য নতুন একটি প্রস্তাবনা করা হয়েছে যেখানে সরাসরি নিয়োগ ধরা হয়েছে ৫৫% এবং পদোন্নতি ৪৫%। এই প্রস্তাবনাটি এখন অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

নিয়োগের জন্য সিএজি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা

এছাড়া সিজিএ অফিসের নিয়োগ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভরশীল। কারণ এই দুই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া এখানে নিয়োগ সম্ভব নয়। নিয়োগের জন্য সিজিএকে প্রথমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিতে হয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তা অর্থ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানায়। অর্থ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত বাজেটের বিবেচনায় সিজিএ-কে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করে। অন্যদিকে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সিএজি অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে এবং তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পিএসসি-কে জনবল নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অর্থ মন্ত্রণালয়। কিন্তু নিয়োগের পরে তার পদোন্নতি, বদলি নিয়ন্ত্রণ করে সিএজি। বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার ছুটির জন্যও ক্যাডার কর্মকর্তাগণ সিএজি-র মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে।

সিজিএ থেকে তাদের জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দেয়। তাদের মতে সিজিএ অফিসের কার্যক্রম যেহেতু স্বয়ংক্রিয় হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে জনবল বাড়ানোর প্রয়োজন নাই। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে এখনও ম্যানুয়ালি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাছাড়া অটোমেশন হলেও বিল যাচাই-বাছাইয়ের বিষয়টি এখনও সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালিই করতে হয়। কম্পিউটারে এন্ট্রির সাথে সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ম্যানুয়ালিও রেজিস্ট্রারে সকল তথ্য এন্ট্রি করতে হয়। আবার অটোমেশন করা হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল এখানে নেই। বৃদ্ধ হওয়ার ফলে অনেক অডিটর ও জুনিয়র অডিটরদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষমতাও নেই। তাদের দ্বারা আধুনিক কম্পিউটারে কাজ করানোও সম্ভব নয়। সেবাগ্রহীতা অফিসগুলোতে জনবল বাড়লেও ২০০৪ সালে সিজিএ অফিসে সর্বশেষ অডিটর নিয়োগের পর আর নতুন নিয়োগ হয়নি। অনেক লোক অবসর নিলেও তাদের শূন্যস্থান পূরণ করা হয়নি। বর্তমানে ১৩৫০ জনের নিয়োগের অনুমোদন এবং ৩৫০ জনের পদোন্নতির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। ২০১১ সালের মার্চ মাসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। তবে সিবিএ'র নিকট থেকে জানা যায় যে, যেসব জুনিয়র অডিটর পদোন্নতি পাবার যোগ্য তাদের পদোন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তারা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করতে দিবে না।

নিয়মিত পদোন্নতি না হওয়া

সিজিএ অফিসের আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে এখানে নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা নাই। জুনিয়র অডিটরগণ প্রায় ২৪/২৫ বছর যাবৎ একই পদে কাজ করছে। তাদের অনেকেই একই পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেছে বা এলপিআরএ গেছে। একই সময়ে সিজিএ এবং সিএজি-তে জুনিয়র অডিটর হিসেবে যোগদান করার পরে সিএজি অফিসের অডিটরদের কয়েক ধাপ পদোন্নতি হলেও সিজিএ-র অডিটরের কোনো পদোন্নতি হয়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দীর্ঘ ২৬ বছর পর জুনিয়র অডিটর থেকে অডিটর পদে মোট ২৯৫ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেক জুনিয়র অডিটর রয়েছে যারা পদোন্নতি পাবার যোগ্য কিন্তু এখনও পদোন্নতি হয়নি। ২০০৪ সালে জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গ করে অনেককে পদোন্নতি দেয়া হয়। আবার অনেক পদোন্নতি পাবার যোগ্য পদগুলোতে পদোন্নতি না দিয়ে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়। এতে যারা বঞ্চিত হয় তারা উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করে। ২০০৯ সালে উচ্চ আদালত তাদের পক্ষে রায় দেয় যা সাম্প্রতিক সময়ে কার্যকর হচ্ছে।

নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন না হওয়া

১৯৮৩ সালে 'এনাম কমিটি'র তৈরিকৃত অর্গানোগ্রাম অনুসারেই এখনও লোকবল কর্মরত রয়েছে। ২০০৪-০৫ এ সিজিএ'র একটি নতুন অর্গানোগ্রাম প্রস্তাব করা হলেও তা এখন পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। বর্তমানে বেশ কিছু পদে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলেও তা '৮৩'র অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী করা হচ্ছে।

৩.২.৫ সিএজি, সিজিএ ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়ে সমস্যা

সাংবিধানিকভাবে সিজিএর যেহেতু এখনও কোনো শক্ত ভিত নাই, সেহেতু এর অরগানোগ্রাম, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ক্ষমতার পরিধি ইত্যাদি বিষয়গুলোও সুনির্দিষ্ট নয়। সংবিধানে সিজিএর দায়-দায়িত্ব, কার্যকাল রিপোর্ট উপস্থাপন, ইত্যাদি সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলা নেই। সংবিধানের ১৩১ নং অনুচ্ছেদে সিএজি'র কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষণের আকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। অথচ সংবিধান পরিবর্তন না করেই অর্থ মন্ত্রণালয় তার আদেশ বলে ২০০২ সালে সিজিএ কে সিএজি থেকে আলাদা করেছে। ফলে বিভাজন হলেও সিজিএ কে কোনো কাজ করতে হলে তা সিএজি থেকে আগে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। আবার সিজিএ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসারে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এভাবে সিজিএকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়।

আবার সিজিএ নিয়োগের ক্ষেত্রে সিএজি তিন জন কর্মকর্তার নাম অনুমোদন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অর্থ মন্ত্রণালয় এই তিন জন থেকে একজনকে সিজিএ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। সিজিএ-র সাংবিধানিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নাই। চূড়ান্ত রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়কে দিতে হয়। আবার এই রিপোর্ট সিএজি'র অনুমোদনেরও প্রয়োজন হয়।

সিজিএ অফিসের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ সিজিএ নিজেই করেন। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলি সিএজি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক শাখা-নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থায় সিএজি এবং অর্থ মন্ত্রণালয় এই দুই পক্ষই কর্মকর্তাদের নিয়োগে ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু সিএজি এবং সিজিএ-কে অবকাঠামোগত দিক থেকে পৃথক করা হয়েছে সেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ প্রয়োজন। অর্থাৎ নিয়োগদানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সিজিএর নেই। সিজিএ কি সিএজির মত স্বাধীনভাবে কাজ করবে নাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা কোনো জায়গায় সুনির্দিষ্ট করা নাই।

৩.২.৬ জবাবদিহিতায় সমস্যা

নৈতিক আচরণবিধির অনুপস্থিতি

সরকারের অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সিজিএ অফিসের হলেও তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সিজিএ'র নিজস্ব কোনো নৈতিক আচরণবিধি (**কোড অফ এথিকস**) নাই। সিজিএ অফিসের কর্মকর্তারা যেহেতু সিএজির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত সেহেতু তাদের সিএজির কোড অব এথিকস্ মেনে চলতে হয়। এই আচরণবিধি পালন ও সিজিএর কার্যক্রম সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তার জন্য এখানে কোনো মনিটরিং ব্যবস্থা নাই। কেউ এই নৈতিক আচরণবিধি অমান্য করলে তার কোনো শাস্তির ব্যবস্থা এখানে করা হয় না। কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কর্মকর্তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে গেলে সিবিএ এর প্রভাবের কারণে তা করা সম্ভব হয় না।

পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ শাখার দায়িত্ব পালনে অবহেলা

সিজিএ'র সকল অফিসের কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা বিভিন্ন অফিসগুলো পরিদর্শন ও তদারকি করে প্রতিবেদন আকারে তা দক্ষতা ও শৃংখলা বিভাগের নিকট পেশ করা হচ্ছে পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ শাখার কাজ। কিন্তু সিজিএ'র এই শাখাটি তাদের এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না। তারা গৎ বাধা, ইচ্ছামত একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সিজিএ ও শৃংখলা শাখায় জমা দেয়। সঠিকভাবে প্রতিবেদন প্রণয়ন না করার জন্য এই সেকশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। আবার পরিদর্শন করার জন্য এই শাখায় তেমন দক্ষ লোকবলও নেই। এই শাখার পরিদর্শনের কাজটি একেক সময় একেক লোক

দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। যারা সকল নিয়ম কানুন এবং আইন সম্পর্কে অবগত থাকে না। ফলে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যহত হয়।

দক্ষতা ও শৃংখলা শাখার দায়িত্ব পালনে অবহেলা

অন্যদিকে দক্ষতা ও শৃংখলা শাখার কাজ হচ্ছে সিজিএ'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভাগীয় ও শৃংখলাজনিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে দোষীকে শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু এই শাখাটিতেও অভিজ্ঞ লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয় যা এই বিভাগের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। কখনও কখনও পরিদর্শন শাখা থেকে কোনো অনিয়ম অব্যস্থাপনার চিত্র শৃংখলা শাখায় তুলে ধরলেও এই শাখার সদিচ্ছার অভাবে কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করে না। সিজিএ'র বিভিন্ন ইউনিটগুলোর মধ্যে সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিটি শাখার লোকজনই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হবে বলেও অন্যায়, দুর্নীতি ও অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় না। এখানে প্রতিটি শাখারই কার্যক্রম পালন না করার জন্য কোনোরকম জবাবদিহি করতে হয় না।

বিধি ও পদ্ধতি শাখার কার্যক্রম পরিষ্কার না থাকা

আবার যেখানে আর্থিক বিধি বিধানের ব্যাখ্যা সিজিএ'র বিধি ও পদ্ধতি শাখার দেয়া উচিত সেখানে বেশীর ভাগ বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সিজিএ অফিসের বিধি ও পদ্ধতি শাখার কার্যক্রম পরিষ্কার নয়।

অবৈধ কার্যক্রমের মনিটরিং না হওয়া

এ্যাকাউন্টস বিভাগকে অডিট থেকে আলাদা করার পরে সিএজি বর্তমানে সিজিএর কাজ মনিটর করছেনা। আবার সিজিএকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় সিজিএর কাজ মনিটর করতে পারছেনা। সিজিএ কী কাজ করছে তা অর্থ মন্ত্রণালয় অবগত নয়। সিজিএর কাজ মনিটর করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে কোনো সেল নাই, দক্ষ লোকবলও নেই। তাদের কার্যক্রমের প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোনো নিয়ন্ত্রণও নেই। ফলে সিজিএর জবাবদিহিতা ভেঙ্গে পরেছে। সিজিএর জবাবদিহিতা এমনই ভেঙ্গে পড়েছে যে ৭ মাস যাবৎ সিজিএর পদ খালি থাকলেও তা নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। সিজিএ না থাকার ফলে এই অফিসের কার্যক্রমের যে ক্ষতি হচ্ছে তা মনিটর করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ নেই।

এমন অনেক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস রয়েছে যেখানে বিভিন্ন সরকারি অফিস থেকে আগত ক্যাশ সরকার, ক্যাশ পিওন বা সংশ্লিষ্ট অফিসের ব্যক্তি নিজেই তার বিলটি কম্পিউটারে এন্ট্রি করে। এমনকি সিএও'র উপস্থিতিতেও ভুয়া বিল অনুমোদন হয়ে যায়। অথচ সিজিএ অফিসের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড মাত্র ৮-১০ জন স্টাফের জানার কথা। বাইরের অফিসের লোকজন কীভাবে এই পাসওয়ার্ড পেল সে বিষয়ে কেউ কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এসব বিষয় সকলেরই জানা থাকলেও এর জন্য কোনো মনিটরিং ব্যবস্থা সিজিএতে নেই।

এখানে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করা ও ঘুষ আদায়ের জন্য দিনের পর দিন বিল ধরে রাখলেও তা মনিটর করার কেউ নেই। বিল ধরে রাখার জন্য তাকে কোনোরকম শাস্তি ভোগ করতে হয়না। যেহেতু দুর্নীতি করে সবাই পার পেয়ে যায় সেহেতু সবাই দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করে। এভাবে দুর্নীতি করার জন্য এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সিজিএ থেকে শুরু করে বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ের সকল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যন্ত সবাই চাইলে একটি বিল কত দিনের মধ্যে পাস হচ্ছে, কত দিন ধরে রাখা হচ্ছে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে মনিটর করার মত সক্ষমতা সিজিএ অফিসে

রয়েছে। কিন্তু এভাবে মনিটর করে কোনো দুর্নীতির ঘটনা ধরা হয়েছে এমন কোনো উদাহরণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই অফিসে কিভাবে দুর্নীতি হচ্ছে তা প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারী জানে। কিন্তু এই দুর্নীতি বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই।

বক্স:৩ সিজিএ অফিসের দুর্নীতি সম্পর্কে একজন জুনিয়র অডিটরের বক্তব্য

২০০৪ সালে আমি সিজিএ'র একজন জুনিয়র অডিটর হিসেবে যোগদান করি। পড়াশুনা করে পাশ করার পর আমি অনেক চাকরি খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। আমার সরকারি চাকরির বয়স প্রায় যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিলো তখন এখানে আমি টাকা দিয়ে চাকরিটা পেয়েছি। সরকারি বা বেসরকারিভাবে যেখানে আমি যোগ্যতা দিয়ে চাকরি পাচ্ছিলাম না সেখানে আমি টাকা দিয়ে চাকরিটা পাওয়া অন্যায় মনে করিনি এই ভেবে যে অন্তত পক্ষে একটা চাকরি তো আমি পেলাম। প্রথম দিকে আমি তো জানতামই না উপরি টাকা কার কাছ থেকে, কীভাবে গ্রহণ করতে হয়। এখানকার পরিবেশ আমাকে তা শিখিয়েছে। আমি যখন আমার উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার নিকট কোনো বিল নিয়ে যাই তখন সে বলে ২০০ টাকা দিতে হবে। তখন আমি টাকাটা কোত্থেকে দিবো? আমি কি টাকাটা আমার পকেট থেকে দিবো? স্বাভাবিকভাবেই যার বিল তার কাছেই চাইবো। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার নাম ভাঙিয়ে অনেকে টাকা খাচ্ছে। তাহলে আমি ভাল থেকে লাভ হলো কী? তখন আমিও উপরি টাকা গ্রহণ করা শুরু করলাম। যেহেতু আমি চাকরিটা টাকা দিয়ে পেয়েছি, সেহেতু সে টাকাটা তোলাও আমার জন্য জরুরী মনে করেছি। আর তাছাড়া আমি ১০,০০০ টাকা বেতন পাই। এ বাজারে একটা ছোটোখাট বাসা ভাড়া করতে হলেও ৮,০০০ টাকা লাগে। সেক্ষেত্রে আমি আমার সংসার খরচ কোথা থেকে চালাবো? বাধ্য হয়েই তখন বেআইনী টাকা গ্রহণ করি। আর আমি যখন দেখছি আমি উপরি ৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেও আমার লাভ ছাড়া কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, আমাকে কারও কাছে কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না তবে আমি কেন নিব না? আর এভাবে তা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এখন উপরি টাকা গ্রহণ করাটা আমার পেশার সাথে নেশাও হয়ে গেছে। এটাই এখানকার সংস্কৃতি। এখানে একটা চেইন আছে। টপ-টু-বটম সবাই অবৈধ আয় করে।

তথ্যসূত্র: মূখ্য তথ্যদাতা

অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ায় দীর্ঘ প্রক্রিয়া

কারো অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়াও অনেক কঠিন কাজ। এ ক্ষেত্রে সিবিএর প্রভাব অনেক শক্তিশালী। অন্যদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে সুদীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কখনও কখনও যিনি পদক্ষেপ নেন তাকেই উল্টো হেনস্তা হতে হয়। ফলে কেউই এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে না।

দুর্বল কাঠামো এই অফিসের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আর একটি বাধা। এডিশনাল সিজিএ প্রশাসন গ্রেড ৪ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। তাকে বিভাগীয় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশাসনিক বিষয়সমূহ ব্যবস্থাপনা করতে হয়। আবার এডিশনাল সিজিএ হিসাবও একজন গ্রেড ৪ এর কর্মকর্তা। এই দুইজনকেই ৫০২টি ইউনিট এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশাসনিক, শৃংখলাজনিত বিষয় এবং হিসাব দেখাশুনা করতে হয়। এত লোকের সব ধরনের সমস্যা শোনা ও মনিটরিং করা এ দুজন কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব হয়না। ফলে দুর্নীতি করার সুযোগ তৈরী হয়।

৩.২.৭ সিজিএর কার্যক্রমের ওপর মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেডিং সমস্যা

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) অফিস বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সরকারি অফিসগুলোর একটি। অথচ এর প্রধান সিজিএ একজন গ্রেড-২ মর্যাদার কর্মকর্তা। সিজিএ'র পরেই অতিরিক্ত সিজিএ যুগ্ম সচিব (গ্রেড-৩) মর্যাদার না হয়ে গ্রেড-৪ মর্যাদার কর্মকর্তা। সিজিএ-র জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার মর্যাদা

হচ্ছে গ্রেড-৯। অন্যদিকে জেলা প্রশাসক গ্রেট-৪ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রেট-৬/৫। ডিসি বা ইউএনও অফিসেই সিজিএর জেলা উপজেলা পর্যায়ের অফিস অবস্থিত। জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যদি কোন আদেশ দেন তা পালন না করার ক্ষমতা ও সাহস ঐ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার থাকে না।

সিজিএ কার্যালয় নিজস্ব বিধি-বিধান অনুযায়ী কাজ করতে না পারার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো প্রতিনিয়ত সচিবালয়ের কর্মকর্তা যেমন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, ডেপুটি সচিব কর্তৃক হস্তক্ষেপ। সিজিএ অফিসের অধিকাংশ সিএও সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের তুলনায় জুনিয়র। তাই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবগণ তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। সিএওর এসিআর সিজিএ লিখলেও কাউন্টার সাক্ষর করেন সংশ্লিষ্ট সচিব। সুতরাং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সিএও-র কর্মকান্ডে এর প্রভাব পড়ে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিসের বিলে আপত্তি দেওয়ার প্রয়োজন হলেও দেখা যায় যে মন্ত্রী বা সচিবের আদেশে অনেক সময় ভুয়া বিল পাস করিয়ে দিতে হয়।

সিএও যেহেতু পদ মর্যাদায় মন্ত্রী, সচিবগণ থেকে অনেক নিচু গ্রেডে কাজ করে সেহেতু মন্ত্রী, সচিবগণ তাদের বিলে আপত্তি দেওয়াকে ধৃষ্টতা মনে করে। তারা আর্থিক হিসাবের নিয়ম-কানুন মানতে চায় না। সিএও'র কেবল বিলে আপত্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এই আপত্তি বাতিল বা খারিজ করার ক্ষমতা সচিবের রয়েছে। কারণ তারা হলেন প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার। সরকারের হিসাব সম্বন্ধে তাদের বেশির ভাগেরই ধারণার অভাব থাকলেও তারা এ পদটি উপভোগ করে এবং অনিয়ম করে পার পেয়ে যায়। কখনও যদি সিএও বিল পাস না করে, সচিব বিল পাস করিয়ে দেওয়ার জন্য ফোন করে। বিলে যদি আপত্তি হিসেবে বলা হয় যে, আইন অনুযায়ী এ বিল পাস করা সম্ভব নয়, তখন মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, 'রাখেন আপনার আইন কানুন; বিলটা পাস করে দেন।' আর এভাবে সিজিএ আর্থিক বিধিবিধান স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। তখন সিএও বিল পাস করাতে বাধ্য হয়। সচিবদের এসব অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও মন্ত্রণালয় থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

বক্স ৪: সচিবের ক্ষমতার অপব্যবহার

একজন অডিটর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার একটি বিলে আপত্তি প্রদান করে। কারণ উক্ত বিলে মন্ত্রণালয় কোনো প্রকার ভাউচার বা প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ করেনি। এ প্রেক্ষাপটে তিনবার সে বিলে আপত্তি প্রদান করা হয়। নিয়মানুসারে একজন অডিটর তিনবার কোনো বিলে আপত্তি প্রদান করতে পারে। চতুর্থ আপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সিএও এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সেই নিয়ম মেনে সিএও'র অনুমোদনের জন্য বিলটি তার কাছে উপস্থাপন করা হয়। সিএও বিলটি যাচাই বাছাই করে 'কোনো ভাবেই বিলটি পাস করা যাবেনা' বলে মন্তব্য করেন। তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে তার অনুমোদনের ভিত্তিতে বিলটিতে চতুর্থ আপত্তি প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে সিএওকে ডেকে পাঠানো হয়। তাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বিলটি পাস করে দেয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে। সচিব সাহেব সিএও কে বিলের ওপর 'আমি মৌখিক অনুমোদন দিলাম' এই নোট দিয়ে বিলটি পাস করে দিতে বলে এবং অন্যথায় এর পরিণতি খারাপ হবে বলে তাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। সিএও তখন মন খারাপ করে সচিবালয় থেকে ফিরে আসে এবং অডিটরকে বিলটি পাস করে দিতে বলেন। অডিটর এই মৌখিক অনুমোদনের ভিত্তিতে অবৈধ বিলটি পাস করে দিতে বাধ্য হয়।

সিজিএ কর্মচারীদের শিক্ষাগতযোগ্যতার সাথে গ্রেডিং এবং আর্থিক দিকটি সমন্বিত নয়। ১৯৭৩ সালে অডিটরদের যে পে-স্কেল ছিল ১৯৭৭ সালে তা কমে যায়। সিজিএ ব্যতিত অন্যান্য বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চাকরিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে কিন্তু সিজিএ তে তা পারে না। সরকারি নিয়মানুযায়ী চাকরিতে যোগদান করার ৫ বছর পর কিছু বাছাইকৃত কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড পায়। অডিটর পদের জন্য সিলেক্শন গ্রেড এর ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ২০/৮/৯৮ সালে তা বাতিল করা হয়। যেখানে নার্স, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, সমবায় অফিসার, সাব রেজিস্টার দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা

সেখানে অডিটর তৃতীয় শ্রেণীর। ব্লক সুপারভাইজারকে চার স্কেল নীচ থেকে অডিটর স্কেলে আনা হয়েছে এবং একই সাথে সিলেক্শন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

রাজনৈতিক চাপের কারণে আঞ্চলিক অফিসগুলোতে অবৈধ বিল পাস করাতে সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাধ্য হয়। এসব বিলের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। ফলে সেখানে অবৈধ বিল পাস করার জন্য সিজিএ অফিসের স্টাফরা ঘুষ গ্রহণ করে। এখানে একটা উইন-উইন পরিস্থিতি তৈরী হয়।

৩.২.৮ দক্ষতা অনুসারে কাজের বন্টন না হওয়া

বাংলাদেশে এ্যাকাউন্টিং বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও অডিট বিষয়ে শিখতে হয় বিশেষ অধ্যয়নের (চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং) মাধ্যমে। সিজিএতে এমন অনেক ব্যক্তি অডিটে আছেন যাদের একাউন্টস কিংবা অডিট কোনোটি সংক্রান্ত শিক্ষাগত জ্ঞান নাই। ক্যাডার কর্মকর্তারা বিসিএস-এর মাধ্যমে আসেন যেখানে বিষয়ভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয় না। যারা নিয়োগ পেয়ে আসেন তারা অডিট এবং এ্যাকাউন্টস বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুই জানে না। নিয়োগ প্রাপ্তির পরে যদিও তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কিন্তু ১০ মাসের সংক্ষিপ্ত একটি প্রশিক্ষণ তাদের প্রয়োগিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

আবার কোনো কর্মকর্তা যে বিষয়ে দক্ষ বা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাকে সে অনুযায়ী পদায়ন করা হয় না। সিএজি যেখানে পদায়ন করেন সেখানেই তাকে কাজ করতে হয়। টেকনিক্যাল পদগুলোতে এ নিয়মটি পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না। যেমন, বর্তমান সিজিএ পারফরম্যান্স অডিট এর উপর বিভিন্ন দেশ থেকে ১১ মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছেন, অথচ তাকে ডিজি, পারফরম্যান্স অডিটে পদায়ন করা হয়নি।

৩.২.৯ অফিস স্থাপনা ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব

অবকাঠামোগত সমস্যা সিজিএ অফিসের অন্যতম সমস্যা। কোনো কোনো প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে কর্মচারীদের বসার জায়গা অপ্রতুল। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসের প্রধান সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামোগত সমস্যা। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ অফিসের নিজস্ব কোনো অফিস নাই। এই অফিসগুলো উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অফিসে এবং জেলা পর্যায়ে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে অবস্থিত। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কক্ষটিসহ উপজেলা পর্যায়ে দুই থেকে তিনটি কক্ষ নিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসের অবস্থান। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি অফিসেই রেজিস্ট্রার ও কাগজপত্রের বড় বড় স্তুপ। রেজিস্ট্রারগুলো ব্যবহার করতে করতে ছিড়ে যাচ্ছে। এই স্তুপ থেকে কোনো কাগজ বের করে কাজ করাও কষ্টকর।

হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোতে আসবাবপত্রের সমস্যাও খুব প্রকট। বিশেষ করে জেলা উপজেলা অফিসসমূহে এই সমস্যা ঢাকা অফিস থেকে অনেক বেশি। প্রয়োজনীয় আলমিরাসহ অন্যান্য জিনিসপত্রের অভাবে কাগজপত্র, রেজিস্ট্রার, ফাইলপত্রসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ব্যবস্থাপনা করা যাচ্ছে না। একটি জেলা ও একটি উপজেলার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। জেলা পর্যায়ে দেখা গেছে মোট ১১৭টি সরকারি অফিসের ৫৫০ জন কর্মকর্তা এবং ৪৫০০ জন কর্মচারীর বিল পাস করানো হয়। প্রতি মাসে গড়ে ৩০০০ থেকে ৩৫০০টি চেক এ অফিস থেকে পাস করানো হয়। উপজেলা পর্যায়ে দেখা গেছে প্রায় ২৪টি সরকারি অফিসের ২৪২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর হিসাব রাখে এই হিসাবরক্ষণ অফিস। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র রাখার তেমন কোনো স্টোর না থাকায় তা কোনো বারান্দা বা ছোট রুমে স্তুপাকারে রাখা হচ্ছে। বেশিরভাগ উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে কোনো টেলিফোন নাই। প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাবে সকল উপজেলায় মোবাইল ও এর বিল দেওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান আটোমেশন প্রক্রিয়ার অধীনে যারা ডাটা ইনপুট ও অন্যান্য কম্পিউটার সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে জড়িত তারা অপর্যাপ্ত কম্পিউটারের কারণে সময়মত সকল কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে না। একটি সিএও অফিস পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সেখানে কম্পিউটার আছে ৮টি। তার মধ্যে ৪টিই নষ্ট। সচল ৪টি কম্পিউটারের মধ্যে ২টিতে আইবাস সফট্ওয়্যারটি সাপোর্ট করেনা। অন্য দুটি কম্পিউটারের ওপর কাজের চাপ অনেক বেশি থাকে বলে এখানে সময়মত কাজ করা প্রায়ই সম্ভব হয়না। প্রায় প্রতিটি সিএও অফিসের চিত্রই একই রকম।

অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় যত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সম্পর্কিত উপকরণ দরকার তা দাতা সংস্থা সরবরাহ করছে। ভবিষ্যতে এ প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে এ ধরনের উপকরণকে সরবরাহ করবে তা নিয়ে সিজিএ অনিশ্চয়তায় রয়েছে। বর্তমান কম্পিউটারগুলোতে যে কনফিগারেশন রয়েছে ৫ বছর পর তা পুরনো হয়ে যাবে। তখন এই কম্পিউটারগুলো তথ্য সংগ্রহে যথার্থ সাপোর্ট দিতে পারবে না। ৫ বছর পরে সরকার কম্পিউটার ও অন্যান্য উপকরণ যেমন প্রিন্টার, কালি, কাগজ, কম্পিউটার মেরামত ইত্যাদি সরবরাহে সহায়তা করবে কিনা তা নিয়ে সিজিএ'র যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই অটোমেশন প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে কতটুকু সফল হবে তা বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

সিজিএ অফিসে প্রতিদিন মাত্র ৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে যা মোট কর্মঘন্টার অর্ধেক। অন্যদিকে জেনারেটর, আইপিএস বা ইউপিএস-এর জন্যও কোনো বাজেট নাই। লোড শেডিং সমস্যার জন্য ২০০৫ সালে সার্ভে করে একটা জেনারেটর বসানোর কথা ছিল। কিন্তু কম্পাউন্ড সিজিএর হলেও এটি এনবিআর-এ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেনারেটর বসানোর বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ সিজিএ-র সিদ্ধান্তকে খাটো করে দেখে। এভাবে নানা অজুহাতে জেনারেটর বসানোর বিষয়টি পিছিয়ে যাচ্ছে। অটোমেশন প্রক্রিয়ার সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের উপর। বিদ্যুৎ না থাকলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সিজিএ অফিসের কম্পিউটার ল্যাব পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে সেখানে শুধু একটি কম্পিউটারে কাজ করা হচ্ছে। বাকি সবগুলো কম্পিউটার বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বন্ধ রয়েছে। জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। আর বিদ্যুৎ না থাকলে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক বিল সাথে সাথে কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে বিল জমা দিতে আসা সকলকে টোকেন এর জন্য ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

৩.২.১০ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব

সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এজিবি কলোনিতে আবাসন থাকলেও তারা তা পায় না। সরকারি অফিসারদের আবাসন এর জন্য কতগুলো টাইপ আছে। যেমন- এ টাইপ, বি টাইপ ইত্যাদি। আবাসনের জন্য আবাসন অধিদপ্তরে আবেদন করতে হয়। সিজিএর অনুমোদন নিয়ে এই আবেদন আবাসন বিভাগে যায়। কিন্তু আবেদন করে কেউ ঘুষ না দিয়ে বা তদবির না করে আবাসন পেয়েছে এমন উদাহরণ সিজিএ তে নাই। গৃহায়ন ও গণপূর্তে ঘুষ না দিলে কোন ভালো আবাসন পাওয়া যায় না। যে আগে দেয় সে আগে পায়। কোনো এক কর্মকর্তা গৃহায়নে তার প্রাপ্য আবাসনের জন্য আবেদন করে ছয় মাসেও তা পাননি। ঘুষ দিয়ে তা আদায় করার চেষ্টা যখন তিনি করলেন তখন জানতে পারলেন তার লেভেলের জন্য বরাদ্দ স্থানটি অন্য একজন আগে এসে ঘুষ দিয়ে নিয়ে নিয়েছেন। এক সময় এজিবি কলোনী শুধুই সিজিএ-র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ ছিল। সম্প্রতি এজিবি কলোনীর দায়িত্ব পুরোপুরি গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে। এখন যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এই বাসা পেতে পারে যা সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

সিজিএ অফিসে ট্রান্সপোর্ট সমস্যা একটি বড় সমস্যা। এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগাযোগের জন্য তেমন কোনো যানবাহন সুবিধা নাই। গাড়ি কেনার জন্য পর্যাপ্ত বাজেটও নাই। ঢাকা অফিসে কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য মাত্র ছয়টি গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে। এই গাড়িগুলো শুধু গ্রেড ছয় এবং তার চেয়ে উচ্চপদস্থ

কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ। অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য কোনো গাড়ি বরাদ্দ নেই। এমনকি সিএও বা এন্ট্রি লেভেলের কর্মকর্তাদের জন্যও কোনো গাড়ি বরাদ্দ নাই। কখনও অফিসের কাজে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিজি প্রেস কিংবা গাজিপুরে বা বাইরে যেতে হলে সবচেয়ে বড় সমস্যা পোহাতে হয়। তখন প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে হয়। সিজিএ অফিসের ছয়টি গাড়ির মধ্যে সিজিএ ও অতিরিক্ত সিজিএ এর জন্য একটি গাড়ি, ২ জন সহকারী সিজিএ এর জন্য একটি গাড়ি এবং বাকী ৪টি গাড়ি গ্রেড ৬ এর কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এ ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে আরো ছয়টি গাড়ি রয়েছে।

৩.২.১১ প্রশিক্ষণে সমস্যা

সিজিএ অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের নিজস্ব কোনো ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সেন্টার নাই। পূর্বে সিএজি'র নিয়ন্ত্রণে সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এখনও সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নানা ধরণের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। চাকরি পাওয়ার পর ফিমা থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কোনো প্রশিক্ষণই সঠিকভাবে সম্পন্ন করানো হয় না। আর ফিমার মাধ্যমেই একমাত্র সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণগুলো সিজিএর প্রয়োজন অনুসারে হয় না। বরং ফিমা প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করে সিজিএ কে জানায়। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের লোকজন প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে উল্টোভাবে সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ফলে কী বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকে জানানো হয় না। তাছাড়া এখনো পুরনো ধাঁচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং তা কেবল থিওরিতেই থেকে যায় । যেমন, এখনও বঙ্গানুবাদ শেখানো হয় যার সাথে কাজের কোনো সংগতিই নেই। ফলে বর্তমান কাজের সাথে সংগতিহীন বলে তা কাজে লাগানো যায় না। অন্যদিকে ফিমা থেকে এখানে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা ফিমা নিজের মত করে প্রদান করে। ফিমাতে স্থায়ী কোনো প্রশিক্ষকও থাকে না। ফলে সিলেবাস হালনাগাদ করার প্রতিও আগ্রহ কম। এখানে প্রশিক্ষণ শেষে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় পাস ফেলেরও কোনো বিষয় নেই। কোনো প্রকার সনদও এখান থেকে প্রদান করা হয় না। আবার পেশাগত প্রশিক্ষণগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় এত স্বল্প সময়ের জন্য করানো হয় যে তার থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজে লাগাতে পারে না।

৩.২.১২ অপর্যাপ্ত বাজেট

সিজিএর কার্যক্রম প্রতি বছর যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার বাজেট সে তুলনায় বাড়ছে না। সিজিএর বর্তমানে যেখানে ২৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন সেখানে বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে ২০ কোটি টাকা। পূর্বে বাজেট বরাদ্দ সভাগুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো প্রশ্ন করা হতো না। কিন্তু এই অর্থ বছরের বাজেট সভায় অর্থ বিভাগ হতে বেতন-ভাতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বর্তমানে পে স্কেল বৃদ্ধি পেলেও অর্থ বিভাগ পে স্কেলের সাথে ভাতা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আপত্তি তোলে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর যেখানে বাজেট ছিল ১১ কোটি টাকা সেখানে বর্তমান বছরে কেন ২৪ কোটি টাকা চাহিদা দেওয়া হল অর্থ বিভাগ থেকে সে প্রশ্ন করা হয়। এর উত্তরে সিজিএ বাজেট বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে। এগুলো হলো - চলতি অর্থ বছরের বাজেটে গত বছরের জুন মাসের ব্যয় যোগ করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাত মাসে চারটি বিভাগীয় পদোন্নতি দেওয়ার কারণে এরিয়ার প্রদান, কম্পিউটার ও কম্পিউটার সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণের ব্যয় যুক্ত করা। পূর্বে কম্পিউটার ও অন্যান্য উপকরণ এফএমআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হত বিধায় এ খাতের ব্যয় বাজেটে ধরা হত না। জুন ২০১০ এ এই প্রকল্প শেষ হওয়ায় কম্পিউটার কার্যক্রম সংক্রান্ত উপকরণের একটি ব্যয় বাজেটে রাখা হয়েছে।

সিজিএ অফিসের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারাদেশে ৪২৩টি ইউনিটের পরিচালনা ব্যয় বাবদ মাসে গড়ে ৫১৬ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা দিয়ে একটি ইউনিট অফিসের ব্যয় নির্বাহ করাও অসম্ভব।

উদাহরণ হিসেবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কাবিখা[১৬], টিআর[১৭], জিআর[১৮] এর মত বিভিন্ন রকমের ত্রাণের বিল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম নথি ফটোকপি করতে হয়। কিন্তু এই ফটোকপির জন্য বাজেটে কোনো খাত নেই। ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে এ অফিস তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

আবার সিজিএ অফিসকে প্রতিনিয়তই সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এলপিসিসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পাঠাতে হয়। একটি চিঠি সরবরাহে কমপক্ষে ২ টাকা ব্যয় হলেও মাসিক প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অথচ এ খাতে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা। বিভিন্ন বিল প্রদানের জন্য যে পরিমাণ স্টাম্প সিজিএর প্রয়োজন তা তারা পায় না। অর্থ বিভাগ থেকে বলা হয় এ স্ট্যাম্প অব্যবহৃত থাকে। সিজিএ অফিসের মতে তাদের প্রতি বছরই স্টাম্পের ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সিজিএ কর্মকর্তারা অবৈধ কাজ করতে বাধ্য হয় এবং ইউনিট অফিসসমূহকে গ্রাহকের নিকট হতে টাকা ধার করে তাদের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

৩.২.১৩ নাগরিক সনদে সীমাবদ্ধতা

একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কাদের কী ধরনের সেবা দিবে, কত সময়ের মধ্যে দিবে, কী পরিমাণ ফি এর বিনিময়ে দিবে, সেবার উৎকর্ষ সাধনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং যথাযথভাবে সেবা না পেলে জনগণ কোথায় ও কী প্রক্রিয়ার অভিযোগ দাখিল করবে তার বিবরণ সম্বলিত একটি ডকুমেন্ট হলো নাগরিক সনদ যা জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। তবে মনে রাখা দরকার, নাগরিক সনদ কোনো আইনগত দলিল নয়। এটি নতুন কোনো অধিকারের জন্মও দেয় না, বরং বিদ্যমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে মাত্র। জনগণ কী পাওয়ার অধিকার রাখে অর্থাৎ সেবাদানকারীরা কী দিতে বাধ্য তাই নাগরিক সনদের প্রতিপাদ্য বিষয়।[১৯] সিজিএ প্রণীত নাগরিক সনদ বিশ্লেষণ করে নিচের সমস্যাগুলো পাওয়া যায়:

- সিজিএ অফিসের নাগরিক সনদ সিজিএ'র ওয়েবসাইটে সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেজিতে রয়েছে। ফলে তা অনেক কর্মচারীদের নিকট বোধগম্য নয়। এটিকে আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাগরিক সনদও বলা যাবে না। বাংলা সনদটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেখা যায়। এজন্য স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সনদটি আসলে কার- সিজিএর নাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের;
- এই সনদটি সিজিএ অফিসের দু একটি জায়গায় টানানো থাকলেও সিজিএর প্রধান গেটসহ অন্য কোনো শাখা অফিসে সাধারণ মানুষের জন্য এটি টানানো নেই;
- এই সনদে উল্লিখিত কার্যাবলী যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা রয়েছে তা মেনে চলা হয় না;
- সনদ প্রণয়নের সময় সিজিএ অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ না থাকায় এতে স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রকাশ পায়নি;
- কীভাবে সেবার মান উন্নত করা যাবে তার উল্লেখ নেই এবং এখানে কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উল্লেখ নেই;
- সনদ প্রণয়নের তারিখ উল্লেখ নেই। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর হালনাগাদ করার সুযোগ নেই;
- নাগরিক সনদ এর কোনো প্রচারণা হয়নি এবং

[১৬] কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ কাজের বিনিময়ে খাদ্য পেয়ে থাকে

[১৭] টেস্ট রিলিফ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিতরণকৃত ত্রাণ

[১৮] গ্রাচুইটাস রিলিফ, কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছাস/ভূমিকম্প জনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিতরণকৃত ত্রাণ

[১৯] আরিফ এইচ খান, নাগরিক সনদ: কী, কেন এবং কীভাবে, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও টিআইবি আয়োজিত সেমিনারে প্রকাশিত প্রবন্ধ

- বিভিন্ন সরকারি অফিসগুলোতে তথ্য নিয়ে দেখা গেছে এই নাগরিক সনদ সম্পর্কে তাদের কিছুই জানানো হয়নি। এমনকি জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসও এ সনদ বিষয়ে কিছু জানে না। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সিজিএ অফিসে কোনো রকম চাপ সৃষ্টিও করতে পারে না।

৩.২.১৪ সিজিএ অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতার সার্বিক চিত্র

সিজিএ অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে তার একটি সার্বিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

চিত্র ৪: সিজিএ অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতার সার্বিক চিত্রের ফ্লো চার্ট

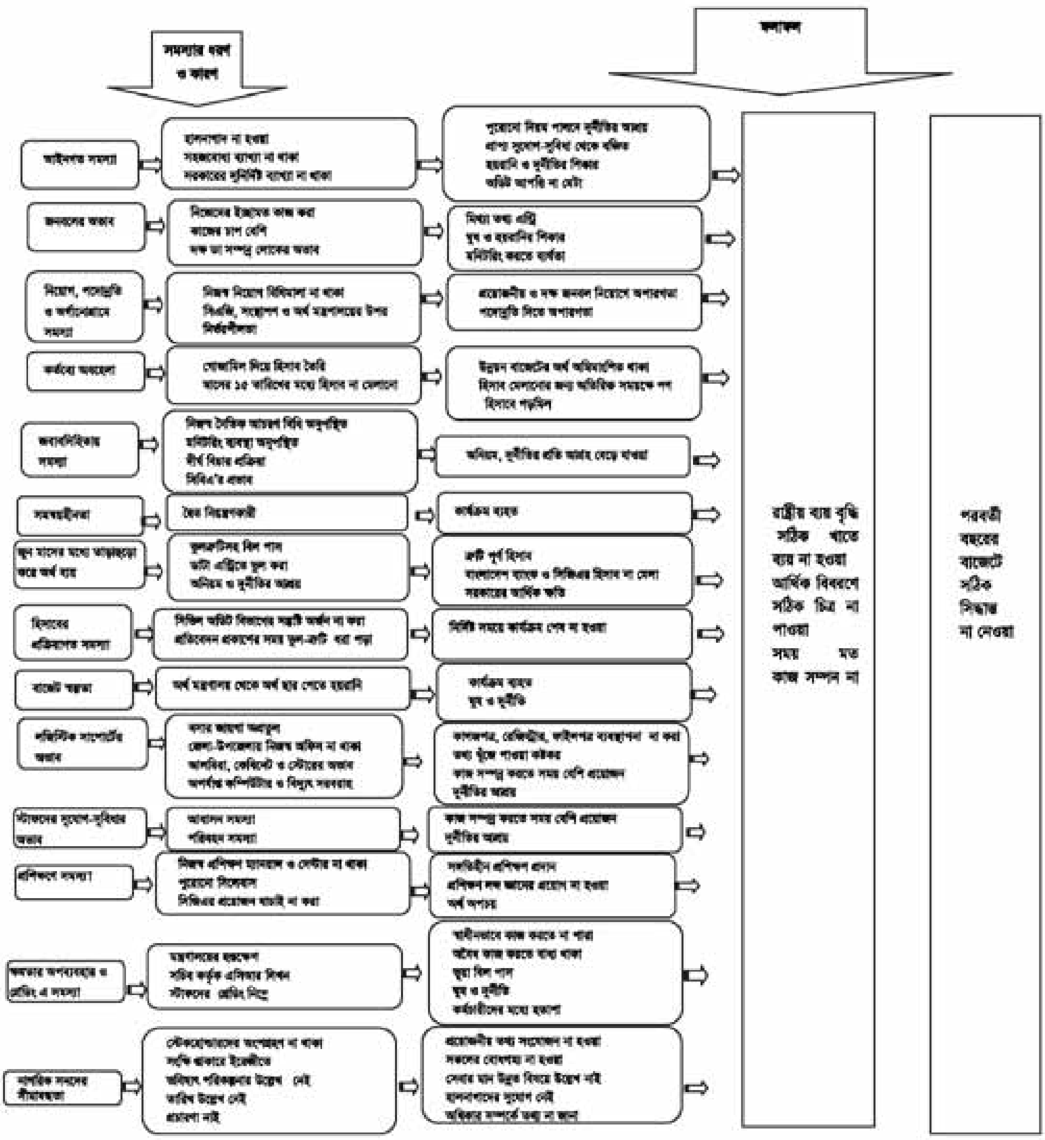

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আইনগত ও নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সিজিএ অফিসের কার্যক্রম বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের উপরে। সিজিএ অফিস যেসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান, ম্যানুয়াল ও নীতিমালা অনুসরণ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার বেশিরভাগই হালনাগাদ নয়। ফলে বর্তমান সময়ের সাথে এসব আইন-কানুন অনুসরণ করতে গিয়ে প্রায়ই তা মানা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে একদিকে হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্যদিকে আর্থিক প্রতিবেদনগুলোতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সঠিক চিত্রও পাওয়া যাচ্ছে না যার। এই আর্থিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যে বাজেট প্রণীত হচ্ছে তার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। আবার দক্ষ জনবলের অভাব, নিয়োগ ও পদোন্নতি না হওয়া, সিএজি, অর্থ-মন্ত্রণালয় ও সিজিএর কাজের সমন্বয়হীনতা, সরকারি বিভাগগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি, হিসাবের প্রক্রিয়াগত সমস্যা, লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব, মন্ত্রণালয়গুলোর হস্তক্ষেপ, দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা ও নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি, সঠিকভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে না কার্যক্রম। ফলে হিসাবের সঠিক চিত্র ফুটে উঠছে না আর্থিক প্রতিবেদনগুলোতে। এই আর্থিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরে যে বাজেট তৈরি করা হচ্ছে তাও হচ্ছে ক্রটিযুক্ত, যা দেশের সফল অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক হচ্ছে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সিজিএ অফিসের অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি অর্থ নিয়ম কানুন অনুসরণ করে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করা সিজিএ অফিসের দায়িত্ব। এই অফিসই বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পেনশন, মেরামত ও সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল অর্থ সংক্রান্ত ব্যয়ের নিরীক্ষা সাপেক্ষে বিল পাস করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সরকারি অফিসের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো আত্মসাৎ হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করা সিজিএ অফিসের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেবাগ্রহী অফিসগুলোকে নানাবিধ বিল পাস করানো ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সিজিএ অফিসের সহায়তা নিতে হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কিনা, ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট আছে কিনা, সংশ্লিষ্ট নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা এবং মঞ্জুরী[২০] আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিরীক্ষা করে সিজিএ অফিস বিল অনুমোদন করে থাকে। সিজিএ অফিসের দায়িত্ব হচ্ছে যেসব বিলে কোনো সমস্যা না থাকে সেগুলোকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পাস করে চেক ডেলিভারি দেওয়া, আর যেসব বিল নিয়ম মাফিক হয়নি সেগুলোর উপরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপত্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে সিজিএ অফিস অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতি করে এবং সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করে। সিজিএ অফিস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা-উপজেলা অফিসসমূহের স্ব স্ব বিভাগের প্রাপ্ত বরাদ্দের ভিত্তিতে বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য দাবীসমূহ পরিশোধ করে। কিন্তু এসব দাবীসমূহ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা-উপজেলা অফিসসমূহের প্রতিনিয়ত অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হয়।[২১] এই অধ্যায়ে সেবাগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলো সিজিএ অফিস দ্বারা কী ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয় সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১ নিয়োগ, পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিয়োগে দুর্নীতি সিজিএ অফিসের দুর্নীতির একটি বড় চিত্র। কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সিবিএ'র সম্মতি ছাড়া করা কখনই সম্ভব নয়। কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সিজিএ ও সিবিএ নেতাদের মধ্যে দর কষাকষি চলে। এক্ষেত্রে সিবিএ নির্ধারণ করে কতজন দলীয় লোক নিয়োগ দিতে হবে। সিজিএ তাতে রাজী না হলে কখনই এই নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব নয়। আর যেসব লোক সিবিএ সুপারিশে নিয়োগ হয় তাদের প্রত্যেককেই ঘুষ প্রদান করতে হয়। এ ধরনের নিয়োগের সাথে মন্ত্রীরাও জড়িত থাকে। তদবিরও চলে সমান তালে। ঘুষ দিয়েও এ তদবির হয়। মুখ্য তথ্যদাতার মতে ২০০৪ সালে নিয়োগ প্রাপ্ত ৪০% অডিটর ঘুষ, লবিং ও তদবিরের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছে।

যে সব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক লেনদেন, বাজেট, সরকারি অফিস ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ও প্রকল্পের সংখ্যা বেশি সেসব মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে পদায়ন বা বদলি হওয়ার জন্য আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং স্বজনপ্রীতি করা হয়। যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, এলজিআরডি, পূর্ত, কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, আইআরডি ও বাণিজ্যসহ অন্যান্য যেসব সিএও মন্ত্রণালয়গুলোর আর্থিক লেনদেন, বাজেট, সরকারি অফিস ও কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রকল্পের সংখ্যা বেশি সেসব সিএও মন্ত্রণালয় অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পদায়ন পাওয়ার জন্য মন্ত্রী. এমপিদের মাধ্যমে সুপারিশ

[২০] ব্যয় করার অনুমোদন।

[২১] জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর, ২০১০।

করানো এবং ঘুষ লেনদেন করে থাকে। ফলে অবৈধ পন্থায় পদায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক দুর্নীতি করার ব্যাপক প্রবণতা থাকে।

সর্বোচ্চ প্রতি তিন বছর পর পর বদলি সরকারি নির্দেশনা থাকলেও সিজিএর বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বছরের পর বছর একই অফিসে কর্মরত আছেন। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করা হলেও তারা ঘুরে ফিরে স্বজনপ্রীতি, ঘুষ প্রদান ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আবার একই অফিসে চলে আসে।

বক্স ১: কর্মচারী পদায়নে সিবিএ এর অবৈধ আবদার

একজন সিবিএ নেতা একজন অডিটরকে কুমিল্লা বদলি করার বিষয়ে এডিশনাল সিজিএ, প্রশাসন এর নিকট তদবির নিয়ে আসে। এই এডিশনাল সিজিএ সমস্ত নথিপত্র পড়ে দেখলেন কুমিল্লায় অডিটর পদের জন্য মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে ১৬টি অথচ সেখানে কর্মরত আছে ২২ জন। এ প্রেতি আরো একজন অডিটর এখানে পদায়ন করা অযৌক্তিক বিধায় তিনি বদলি আবেদনটি নাকচ করে দেয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয়বারের মত উক্ত সিবিএ নেতা এডিশনাল সিজিএ'র নিকট আসলে তিনি তা পুনরায় বাতিল করে দেয়। এই কর্মকর্তার মতে, 'আমি নিশ্চিত যে সিবিএ নেতা এই অডিটরের নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে'।

ঢাকার আশেপাশ অঞ্চলের হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোতে পদায়নের ক্ষেত্রেও ব্যাপক রাজনীতিকরণ হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। কর্মচারীর বদলির জন্য সিবিএ নেতারা ঘুষ নিয়ে তদবির করে থাকে। অনেক হিসাবরক্ষণ অফিস রয়েছে যেখানে পদ নেই কিন্তু লোক কাজ করছে। আবার অনেক জায়গায় পদ আছে কিন্তু লোক কাজ করছে না। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীর পদ রয়েছে ৩৮টি কর্মরত আছেন ৪১ জন। অন্যদিকে উপজেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ রয়েছে ৪০০টি কিন্তু কোনো কর্মকর্তা নেই। আবার বিভিন্ন সিএও অফিসগুলোতে পদ রয়েছে ১৫৭টি কিন্তু কর্মরত আছেন ১৬১ জন। উপজেলা পর্যায়ে অনেক হিসাবরক্ষণ অফিস রয়েছে যেখানে কোনো অডিটর নেই। সিজিএ অফিসের এই চিত্রই প্রমান করে যে এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নে কী ধরনের রাজনীতিকরণ ও অনিয়ম হয়ে থাকে।

পদোন্নতি দু'ভাবে হয়। প্রথমত, পদোন্নতি পেতে হলে একজন কর্মচারীকে কমপক্ষে ৩ বছর ফিডার[২২] পদে থাকতে হবে। এ তিন বছরে তার জ্যেষ্ঠতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং চাকরির সন্তুষ্টি পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। এ সব দিক থেকে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে সে সরাসরি পদোন্নতি পাবে। দ্বিতীয়ত, সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য সাবঅর্ডিনেট একাউন্ট সার্ভিস (এসএএস)[২৩] পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষা ব্যবহারিক ও লিখিত দু'ভাবে নেয়া হয়। টাইপিস্ট থেকে শুর করে জুনিয়র অডিটর, অডিটর সকলেই এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই পরীক্ষায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। আত্মীয়তার পরিচয়ে পরীক্ষার ফলাফলে বৈষম্য ও অনিয়ম করা হয়। এখানে ৮০% পাশ করে অডিটর এর নিচের পদ হতে। লিখিত এবং ব্যবহারিক এই দুই পরীক্ষায়ই যেহেতু পাশ করতে হয় সেখানে যারা ব্যবহারিক কাজ করে অভ্যস্ত নয় তারাও খুব সহজেই রাজনৈতিক, সিবিএ ও কর্মকর্তাদের প্রভাব খাটিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাশ করে যায়।

৪.২ নতুন বেতন স্কেল সংযোজনে (Fixation) দুর্নীতি

২০০৯ সালের ১১ নভেম্বর বর্তমান সরকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন স্কেল ঘোষণা করে। দেশের সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২০০৯ সালের জুলাই মাস থেকে নতুন স্কেল অনুসারে বেতন পাবে কিন্তু ভাতাদি পাবে ২০১০ সালের জুলাই থেকে বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই বেতন পেতে হলে–

[২২] একই পদ

[২৩] সুপারিন্টেনডেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য যে পরীক্ষা নেওয়া হয়

সিজিএ অফিসের সার্ভিস বুকে[২৪] সংযোজন[২৫] করা প্রয়োজন। এই সংযোজন করার ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল বেতন কত হবে, বাড়ি ভাড়া কত হবে, মোট কত টাকা পাবে, কবে থেকে তা কার্যকর হবে, কত টাকা জিপিএফ এর জন্য জমা হবে ইত্যাদি তথ্য এই সংযোজন ফরমের মধ্যে এন্ট্রি করে সিজিএ অফিসের মাধ্যমে অনুমোদন নিতে হয়। এই ফরমের তথ্য অনুসারেই পরবর্তীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন পাবে। সংযোজন না হওয়া পর্যন্ত সিজিএ অফিস থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন স্কেলে বেতন বিল পাবে না।

বেতন স্কেল সংযোজনের এই নিয়ম সিজিএ অফিসের ঘুষ আদায়ের উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে। উপরি ছাড়া নতুন বেতন স্কেল সংযোজন করার সংখ্যা খুবই নগন্য। আর এর ব্যতিক্রম হয়নি ২০০৯ সালের নতুন বেতন কাঠামো সংযোজনের সময়েও। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রায় সবাইকেই ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের বেতন কাঠামো সংযোজনের জন্য। নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই সিজিএ অফিসে তা সংযোজন হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন সরকারি অফিসের তথ্যে দেখা গেছে, যেসব অফিস দ্রুত ঘুষ দিতে পেরেছে সেসব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার পরবর্তী মাসেই সন্নিবেশন হয়ে গেছে। আর যাদের ঘুষ দিতে দেরি হয়েছে তাদের নতুন বেতন স্কেল সংযোজন হতেও দেরি হয়েছে। যারা ঘুষের বিনিময়ে তাদের বেতন স্কেল সংযোজন করেছেন তাদেরকে প্রতিজন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণত ৫০ থেকে ৫০০ টাকা সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়েছে। যেসব অফিসের কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থের লেনদেন অনেক বেশি সেখানে সংযোজনের জন্য ঘুষের পরিমাণও বেশি।

বক্স ২: বেতন স্কেল সংযোজনে প্রদানকৃত ঘুষ সম্পর্কিত একটি অফিসের চিত্র

উন্নয়ন খাতে বেশি অর্থের লেনদেন হয় এমন একটি অফিসের তথ্য নিয়ে দেখা গেছে সেখানে জনপ্রতি নতুন বেতন স্কেল সংযোজনের জন্য ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে। এই অফিসের ঘুষের পরিমাণ বিষয়ে একজনের মন্তব্য এইরকম যে, 'ফিক্সেশনের জন্য ৫০০ টাকার নিচে কোন কথাই নাই'। এই অফিসে প্রায় ৩৮০০ থেকে ৪০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। এদের প্রায় ৯০% কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রেই ঘুষ দিতে হয়েছে। বাকি ১০% এর কেউ কেউ তথ্য সংগ্রহকালীনও নতুন স্কেলে তাদের বেতন তুলতে পারেনি বা কেউ কেউ নিজে গিয়ে তাদের ফিক্সেশনের কাজ করিয়ে নিয়েছে। তবে এই অফিসের হিসাব রক্ষকের সাথে যেহেতু সিজিএ অফিসের সম্পর্ক ভাল তাই তার সংযোজনের জন্য ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। এই অফিসের প্রধান এর ক্ষেত্রেও নতুন বেতন স্কেল সংযোজনের জন্য ঘুষ দিতে হয়নি।

কোনো কোনো সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ঘুষ দিতে রাজি না হওয়ায় ২০১০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও অনেকের নতুন বেতন স্কেল সংযোজন হয় নাই। তারা পূর্বের হিসাবেই তাদের বেতন উত্তোলন করছে। তাদের মতে 'দেরিতে হলেও সিজিএ অফিস নতুন পে স্কেল সংযোজন করতে বাধ্য। আমরা ঘুষ দিব না।' কোনো কোনো অফিসের প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য গড়ে ২০০ টাকা করে ঘুষ দিতে হয়েছে। কোনো কোনো অফিস থেকে সমিতির মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ অফিসকে ঘুষ প্রদান করা হয়েছে। অন্য একটি অফিসে দেখা গেছে ৪০ জন কর্মকর্তার ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও নতুন বেতন স্কেল সংযোজন হয়নি। তাদের নতুন স্কেল সংযোজনের জন্য সিএও অফিসের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তখনও স্বাক্ষর করেনি। কোনো কোনো অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন সন্নিবেশনের জন্য সিজিএ অফিসে পাঠানো হলে তা সিএও-র কাছে আটকে আছে। এগুলো পাশ করানোর জন্য দর কষাকষির এক পর্যায়ে তারা প্রতিটি বইয়ের জন্য ২০ টাকা করে দাবী করে। একই অফিসে কর্মচারীদের বকেয়া বিল পাশের জন্য একসাথে প্রায় ১২ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। কোনো কোনো সরকারি অফিসের মতে সিজিএ অফিস সরাসরি কোনো টাকা দাবি করে না।

[২৪] যে বইয়ের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন, ইনক্রিমেন্ট, টাইম স্কেল, জিপিএফ এর পরিমাণসহ সকল হিসাব রাখা হয়

[২৫] কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কত টাকা বেতন পাবে তার বিস্তারিত হিসাব

তবে বেতন সংযোজনের জন্য অনেক দেরি করে, অকারণ ব্যস্ততা দেখায়, দিনের পর দিন তারিখ দেয়। ফলে বাধ্য হয়েই ঘুষ দিতে হয়।

সারণি ৪.১: নতুন বেতন স্কেল সংযোজন করাতে সিজিএ অফিসে প্রদানকৃত ঘুষের পরিমাণ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদবী	ঘুষের পরিমান
গেজেটেড কমকর্তা	১০০-২০০০ টাকা
ননগেজেটেড কমকর্তা	১০০-১০০০ টাকা
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২০-১২০০ টাকা
সমস্যা সম্পন্ন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৫০০-২০০০ টাকা
মাস্টার রোলের কর্মচারী	একদিনের বেতন

যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগে জটিলতা, স্বজনপ্রীতি কিংবা অনিয়ম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নতুন বেতন স্কেল সংযোজন করতে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়। যত বার নতুন বেতন স্কেল দেওয়া হয় তত বারই তাদেরকে এই হয়রানি পোহাতে হয়। তাদের যেহেতু নিয়োগের বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র থাকে না সেহেতু প্রতিটি সংযোজন এর ক্ষেত্রেই এসব কাগজপত্র চেয়ে তাদেরকে হয়রানি করে। কিন্তু ঘুষের বিনিময়ে খুব সহজেই এসব কর্মচারীদের বেতন স্কেল সংযোজন হয়ে যায়। এ ধরনের কর্মচারীদের নিকট থেকে ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয় এবং সিজিএ অফিস নিজেই সমস্ত নকল কাগজপত্র বানিয়ে জমা দিয়ে দেয়।

বেতন সংযোজনে কেন টাকা দেয় এই প্রশ্নের উত্তরে সিজিএ অফিস থেকে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে সংযোজন তো ব্যক্তির স্বার্থে। এটি যত দ্রুত হবে তত দ্রুত ব্যক্তি নতুন কাঠামোতে তার বেতন পাবে। সুতরাং ব্যক্তি চেষ্টা করে বাড়তি টাকা দিয়ে হলেও দ্রুত তার বেতন কাঠামো সংযোজন করাতে। কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে টাকা ছাড়া বিল পাস করাতে পারলেও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেতন সংযোজনে তুলানামূলকভাবে টাকা বেশি নেওয়া হয়। এর পিছনে সিজিএ অফিসের অজুহাত হচ্ছে, কর্মচারীদের সংখ্যা বেশি এবং তাদের সার্ভিস বই সিজিএ অফিসকে লিখতে হয়। আর তা করতে অনেক সময় ব্যয় ও কষ্ট করতে হয়। এজন্য সার্ভিস বই লেখার জন্য তারা কর্মচারীদের নিকট থেকে টাকা নেয়।

৪.৩ প্রথম বেতন ও বোনাস পেতে দুর্নীতি

সাধারণত বেতন বিল পাস করাতে কিছুটা দেরি হলেও ঘুষ প্রদান করতে হয়না। তবে চাকরি পাওয়ার পরে প্রথম বেতন তুলতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করা সিজিএ অফিসের আরেকটি নতুন মাধ্যম। এসময় তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চায়। এ সময় তারা বিভিন্ন কাগজপত্র চেয়ে হয়রানি করে। কিন্তু ঘুষ দিলে খুব সহজেই কাজ হয়ে যায়। এ সময় সিজিএ অফিসের কর্মচারীদের ১০০-২০০ টাকা ঘুষ দিলেই সমস্ত কাজ ঝামেলাহীনভাবে হয়ে যায়। তবে বেতন নিয়মিত হয়ে গেলে হয়রানি কিছুটা কম হয়। প্রথম বেতন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের

বক্স ৫: ডাক্তারের প্রথম বেতন উত্তোলনে হয়রানি

একজন ডাক্তারের (বিসিএস ক্যাডার) ভাষ্য মতে, 'আমার প্রথম বিলেই ধাক্কা খাই। ১৯৮৮ সালে ক্যাডার হওয়ার পর আমার প্রথম বেতন বিল দাখিল করতে যাই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেটও নিয়ে যাই। কিছু দিন পরে বিল আটকে দিয়ে বলে সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। কেন জানি তারা কাগজ ছিঁড়ে বলে এটা দেওয়া হয়নি। পরে আমি নিজেই সিজিএ অফিসে যাই ব্যাপারটা দেখতে। গিয়ে দেখি তারা বিল থেকে সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেটটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমার ধারণা ছিল যে, চোর তো তার চুরির একটা নিদর্শন রেখে যায়। যেখান থেকে তারা কাগজটি ছিঁড়েছে তার স্ট্যাপ্লারের পিন ছেঁড়া হয় নাই। ধরা পরে যাওয়ার পর তারা বলেন, 'আসলে কাজ করতে করতে হয়তো তা ছিঁড়ে গেছে।'

তুলনায় কর্মচারীদের বিশেষ করে প্রকল্পের কর্মচারীদের হয়রানি বেশি করা হয়।

সরকারি অফিসগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বোনাস উত্তোলনেও সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়। যেহেতু বোনাস উত্তোলনের সময় অনেকগুলো টাকা একসাথে দেওয়া হয়, এ সময়ে সিজিএ অফিস কিছু উপরি আয়ের চেষ্টা করে। বোনাস নেওয়ার সময় সাধারণত কর্মচারীদের ১০০-২০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

> বক্স ৬: বোনাস উত্তোলনে ঘুষ প্রদান
> একজন কর্মচারীর মতে বোনাস বিল পাস হতে সিজিএ অফিসে জনপ্রতি এক হাজার টাকাও দিতে হয়েছে। তার মতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায়ই এই চিত্র দেখা যায়।

৪.৪ প্রকল্প ও ঠিকাদারের বিলে দুর্নীতি

সিজিএ অফিসের দুর্নীতির সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের ঠিকাদারদের বিল। এমন কোনো ঠিকাদার নেই যারা সিজিএ অফিসে ঘুষ না দিয়ে বিল পাস করাতে পারে। সকল নিয়ম-কানুন মেনে, প্রয়োজনীয় নথি-পত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও ঠিকাদারদের সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়। কারণ সিজিএ অফিস জানে, ঠিকাদারদের বিলে বিল বাড়িয়ে লেখার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই ঠিকাদারদের সাথে সাথে এই সুযোগে সিজিএ অফিসও বাড়তি অর্থ আয় করে থাকে।

সারণি ৪.২: ঠিকাদারী বিলে ঘুষের পরিমাণ

বিলের পরিমাণ	ঘুষের পরিমাণ (শতকরা হারে)
১ লক্ষ টাকার মধ্যে	৫%-১০%
১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষের মধ্যে	১%-১.৫%
৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ	০.৫০% - ১%
২০ লক্ষের উপরে	০.২০% - ০.৫০%
ঈদ/পূজার সময়ে (যেকোনো বিলে)	সর্বোচ্চ ১০%
মে, জুন মাসে (যেকোনো বিলে)	৫%-১০%

ঠিকাদারের বিল কখনো সংশ্লিষ্ট অফিস নিজ দায়িত্বে সিজিএ অফিস থেকে পাস করিয়ে আনে, কখনো ঠিকাদার নিজেই পাস করিয়ে নেয়। এই দুই ক্ষেত্রেই সিজিএ অফিসকে ঘুষ প্রদান করতে হয়। সবাই যেহেতু জানে যে ঠিকাদারের বিল পাসের জন্য এজি অফিসকে ঘুষ দিতে হবে, তাই ঠিকাদাররাও কাজ নেওয়ার সময় বিল বাড়িয়েই কাজ নিয়ে থাকে। ঠিকাদারদের এই বিলের অংকের উপর সিজিএ অফিসের ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে ঘুষ সাধারণত শতকরা হারে দেওয়া হয়। বিল কম হলে ঘুষের হার বেশি, বিল বেশি হলে ঘুষের হার কম হয়। বিলের পরিমাণ যদি এক লক্ষ টাকা হয় তাহলে সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয় ৫% থেকে ১০%। বিল যদি ১ লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষের মধ্যে হয় তাহলে ১% থেকে ১.৫% ঘুষ নেওয়া হয়। আর বিল যদি পাঁচ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষের মধ্যে হয় তাহলে ০.৫০% থেকে ১% পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়। বিল যদি কোটি টাকা বা তদুর্দ্ধ হয় তাহলে তার জন্য ০.২০% থেকে ০.৫০% পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়। এই ঘুষের পরিমাণ মে, জুন মাসে আরো বেশি হয়ে যায়। এই সময়ে সরকারি অফিসগুলোর অর্থ খরচ করার খুব চাপ থাকে। নতুবা এই অর্থ ফেরত চলে যায়। তাই সিজিএ অফিসেও তখন কাজের চাপ বেড়ে যায়। আর এ সময়ে সিজিএ অফিসের ঘুষের হার ৫% থেকে ১০% এ পৌছায়। আবার বিশেষ সময় যেমন ঈদ বা পূজার সময়ও ঘুষের হার বেশি দেখা যায়। কারণ ঈদ সামনে রেখে দ্রুত বিল পাস করানোর চেষ্টা করা হয়। এসময়েও ঠিকাদারদের বিলের উপরে ১০% পর্যন্ত দিতে হয়। তবে পারস্পারিক সমঝোতা বা সুসম্পর্ক থাকলে ঘুষের পরিমাণ

> **বক্স ৭: ঘুষ না দেওয়ায় ঠিকাদারের বিল আটকে দেওয়া**
> ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ঠিকাদারদের প্রায় সোয়া দুই লাখ টাকার বিল পাস করা হয় সিজিএ-তে। কিন্তু চেক শাখা থেকে চেক ইস্যু করা হয় নাই। এই বিলের কাগজপত্রে কোন সমস্যা ছিল না, সকল ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ ঘটনা সিএও-কে লিখিতভাবে অবহিত করার পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অনেক সময় কম হয় বা ঘুষ ছাড়াও বিল পাস করানো হয়। ঠিকাদার তার নিজ স্বার্থেই সিজিএ অফিসের সাথে সমঝোতার একটা সম্পর্ক তৈরী করে ফেলে। ঠিকাদারদের এই লেনদেন একটা সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। এটাকেই সবাই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছে।

অন্যদিকে ঘুষ না দিলে বা ঘুষের পরিমাণ কম হলে চলে হয়রানি। বিভিন্ন অজুহাতে দিনের পর দিন বিল আটকে রাখা হয়। বক্স ৭ এ একটি অফিসের হয়রানির অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হলো।

৪.৫ গাড়ির তেল/গ্যাস খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি

সিজিএ অফিসের মাধ্যমে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের বিল সাত কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নিয়ম[২৬] থাকলেও দেখা যায় যে সরকারি অফিসগুলোকে প্রায়ই এই বিল পাস করাতে হয়রানির শিকার হতে হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিকট প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গাড়ির তেলের বিল ব্যক্তির নিজের পাস করানোর অভিজ্ঞতা কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সিএনজি বা তেল স্টেশন থেকে তেল বা গ্যাস নেওয়া হয় তারাই সিজিএ অফিসে গিয়ে বিল পাস করায়। সিএনজি বা তেল স্টেশনগুলোকেও টাকার বিনিময়েই এই বিল পাস করাতে হয়। তবে যেহেতু প্রতিটি গাড়ির জন্য তেলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে বরাদ্দ বহির্ভূত ব্যয় করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এ জন্য এই বিল পাশ করাতে সিজিএ অফিসকে ঘুষও দিতে হয় না। তেলের বিলের ক্ষেত্রে একটি অফিসের অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্ন। এই অফিসকে গাড়ির তেলের বিল বাবদও ঘুষ প্রদান করতে হয়। সাধারণত সিজিএ অফিস এ বিলের উপরে ৫% ঘুষ চাইলেও তারা ২% দিয়ে বিল পাস করায়।

তবে সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহার করলে তারা এই বাড়তি তেলের বিল সরকারি কোষাগার থেকে নেওয়ার জন্য বাড়িয়ে বিল করে। এসব ক্ষেত্রে তাদের ঘুষের বিনিময়েই বিল পাস করাতে হয়। এক্ষেত্রে থোক বরাদ্দে ঘুষ প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। কারণ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত বিল করার প্রবণতা দেখা যায় বলে মুখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে তথ্য পাওয়া যায়। আর এই বিল পাস করানোর জন্য সরকারি অফিসগুলো সিজিএ কে ঘুষ প্রদান করে। যদিও সিজিএ এর দায়িত্ব এই বিল পাস না করে আপত্তি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ করা। সাধারণত এই ঘুষের মাত্রা হচ্ছে বিলের ১% থেকে ১০% পর্যন্ত। যেসব ক্ষেত্রে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঠিকাদারের হাতে দেওয়া হয় সেসব ক্ষেত্রেও ঠিকাদারদের বাড়তি টাকা দিয়েই সিজিএ থেকে বিল পাস করিয়ে আনতে হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।

৪.৬ ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিলে দুর্নীতি

সরকারি অফিসগুলোর টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল সরকারি ভাবেই করা হয়। আর এর ফলে এখানে বিল বাড়িয়ে লেখার কোনো সুযোগ নাই। এ জন্য সাধারণত এজি অফিস এই বিলে কোনো বাড়তি টাকা দাবি করে না। তবে টেলিফোন ও ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে সকল অফিসের অভিজ্ঞতা একরকম নয়। কোনো কোনো অফিসের ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিলেও ঘুষ প্রদানের অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

বক্স ৮: ইন্টারনেট সংযোগ ও টেলিফোন বিলে ঘুষ প্রদান

ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সংযোগের জন্য এই অফিসের ১১ লক্ষ টাকার বিল অনুমোদন করার জন্য ঘুষ চাইলে তা দিতে রাজি হয়নি কর্মকর্তারা। ফলে এই বিল তিন মাস পরে পাস করানো হয়। টেলিফোন নেট বাবদ ৪,৫০,০০০ টাকার বিলের ওপরে ২% ঘুষ চাওয়া হয়। এই ঘুষ দিতে দেরি করায় ছয় মাস বিল আটকে রাখা হয়। পরে আবার ২৫০০ টাকা চাইলে ১৫০০ টাকা দিয়ে বিল অনুমোদন নেওয়া হয়।

[২৬] সিটিজেন চার্টার, হিসাব মহা নিরীক্ষক, অর্থ মন্ত্রণালয় ওয়েবসাইট - www.mof.bd.org

৪.৭ কুরিয়ার বিলে দুর্নীতি

অধিকাংশ সরকারি অফিসে দেখা যায় যে প্রয়োজনীয় জিনিস বা চিঠি লেনদেনের ক্ষেত্রে কুরিয়ার ব্যবহার না করে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়। ফলে বিল পাশ করার কোনো বিষয় থাকে না। তবে যেসব অফিসে চিঠিপত্র বা অন্য কোনো জিনিসপত্র কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয় সেসব অফিসের কুরিয়ার বিল পাশ করাতে সিজিএ অফিসকে ১%-৫% পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। কোনো কোনো অফিসকে কুরিয়ার বিল পাশ করাতে কোনো ঘুষ দিতে হয় না।

> **বক্স ৯: কুরিয়ার বিলে ঘুষ প্রদান**
> একজন তথ্যদাতার মতে, তাদের অফিসের ৫০০০ টাকার কুরিয়ার বিল পাশ করাতে সিজিএ অফিসে ২০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

৪.৮ শ্রমিক মজুরির বিলে দুর্নীতি

সংখ্যায় কম হলেও সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে থাকে। সিজিএ অফিস এই শ্রমিকদের বিলের ওপরেও ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত শ্রমিকদের বিল পাস করাতে সিজিএ অফিসকে বিলের ১% ঘুষ প্রদান করতে হয়। তবে শ্রমিকদের নিয়োগের বৈধতার উপরেও ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে। নিয়োগে কোন অনিয়ম থাকলে ঘুষের পরিমাণ বেড়ে যায়।

> **বক্স ১০: শ্রমিক মজুরীর বিল পাসে ঘুষ প্রদান**
> কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় যে ১৯৯৫ সালের নীতিমালা অনুসারে প্রতি শ্রমিককে ১২০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হত। বর্তমানেও একই নীতিমালা প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু বর্তমান প্রেক্ষিতে এই মজুরী খুবই কম সেহেতু উর্দ্ধতন কর্মকর্তা শ্রমিক মজুরী বাড়িয়ে ২৬৫ টাকা করে শ্রমিকদের প্রদান করে। উর্দ্ধতন কর্মকর্তার অনুমোদন সত্ত্বেও এই টাকার উপরে শ্রমিকরা ঘুষ না দিলে তাদেরকে ১২০ টাকা করেই নিতে হয়।

৪.৯ ভ্রমন ও দৈনিক (টিএ, ডিএ) ভাতা বিলে দুর্নীতি

ভ্রমণভাতা বিল সিজিএ অফিসে জমা দেওয়ার তারিখ হতে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তা পাস করার নিয়ম রয়েছে।[২৭] যদি বিলে কোনো অনিয়ম হয় বা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ না করা হয় তাহলে আপত্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, এমন কোনো অফিস নেই যেখানে টিএ, ডিএ বিল পাস করাতে সিজিএ অফিসের মাধ্যমে দুর্নীতির শিকার হতে হয়নি। বিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিল দিতে দেরি হবে, অন্য কাজে ব্যস্ত আছি, বিলের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সরবরাহ করা হয়নি, বিলে কাটাকাটি হয়েছে ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিল আটকে রাখাসহ বিভিন্নভাবে সিজিএ অফিস হয়রানি করে। আবার ঘুষ দিলে খুব সহজেই সে বিল পাস হয়ে যায়। এই বিলে অন্যান্য বিলের মতো ঘুষের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না হলেও বিলের পরিমাণের সাথে ঘুষের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। এই খাতে ঘুষের

> **বক্স ১১: টিএডিএ বিলে ঘুষ লেনদেন**
> একজন ডাক্তার ২০০০ টাকা টিএ-ডিএ বিল করে সিজিএ অফিসে জমা দেয়। দিনের পর দিন চলে যায় তার এই বিলের টাকা তাকে দেওয়া হচ্ছে না। আবার বিলে কোনো আপত্তিও দেওয়া হচ্ছে না। এই ডাক্তার যেহেতু ডিজি অফিস থেকে জেলা পর্যায়ে বদলি হয়ে যাচ্ছেন এ জন্য আর বেশি দিন এই বিলের জন্য অপেক্ষা করতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে সে সিজিএ অফিসে চলে যায় বিল সম্পর্কে জানার জন্য। গিয়ে দেখে বিলটি ফেলে রাখা হয়েছে। বিল না দেওয়ার কারণ কিছুই বলছে না। তখন সে তার ডিজি অফিসে ফোন করে জানতে চাইল এখন তার কি করা উচিত। তখন ডিজি অফিস থেকে বলা হয় সিজিএ অফিসে কিছু টাকা না দিলে তারা এই বিল ছাড়বে না। তখন এই ডাক্তার একজন অডিটরকে ৫০ টাকা ঘুষ দেন এবং বিলটি নিয়ে ফেরত আসেন।

---

[২৭] সিটিজেন চার্টার, হিসাব মহা নিরীক্ষক, অর্থ মন্ত্রণালয় ওয়েবসাইট - www.mof.bd.org

পরিমাণ সাধারণত ১% থেকে ১০% পর্যন্ত ওঠানামা করে। আবার কখনও থোক বরাদ্দে ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা বা তার থেকেও বেশি ঘুষ প্রদান করতে হয়। কখনও কখনও বিল পাস হয়ে গেলে সিজিএ অফিস থেকেই ফোনে যোগাযোগ করা হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে এবং মনে করিয়ে দেওয়া হয় "স্যার, বিল তো হয়ে গেল টাকাটা পাঠিয়ে দিবেন"।

টিএ-ডিএ বিলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানে বিল বাড়িয়ে লেখার সুযোগ রয়েছে। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই এনটাইটেল্ড না হয়েও সেই পরিমাণ বিল করে সিজিএ অফিসে পাসের জন্য জমা দেন এবং তা ঘুষের বিনিময়ে পাসও করিয়ে নেন। আবার ঘুষ না দিলে যে পরিমাণ বিল সে পাওয়ার কথা সে পরিমাণ বিলই তাকে নিতে হয়। তবে এক্ষেত্রে তাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয় বিল পাসের জন্য। যেমন একজন কর্মকর্তা বিমানের জন্য এনটাইটেল্ড না হয়েও বিমানের বিল জমা দিলে তা পাশ করার কথা নয়। কিন্তু সিজিএ অফিসে ঘুষের বিনিময়ে তা পাস করিয়ে নিতে পারে। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী টিএ-ডিএ বিল বাড়িয়ে লেখে এবং তা ঘুষের বিনিময়ে পাস করিয়ে নেয়। আবার কর্মচারীদের জন্য টিএ বিল বরাদ্দ রয়েছে প্রতি কিলোমিটার ১ টাকা ২৫ পয়সা যা বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে তারা টিএ বিল বাড়িয়ে লেখে এবং ঘুষের বিনিময়ে তা পাস করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই এই অবৈধ বিল পাস করানোর জন্য ঘুষ দিতে চায়। আর সিজিএ অফিস এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে টিএ-ডিএ বিল পাস করানোর জন্য ঘুষ নেয়। অথচ এই ধরনের অবৈধ বিল পাস না করিয়ে তাতে আপত্তি দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে সিজিএ'র কাজ। কিন্তু তারা ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের এ মহান দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায়।

সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি হলে ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসা বাড়ির জিনিসপত্রসহ সকল জিনিসপত্র স্থানান্তরের জন্য সরকার থেকে বিল দেওয়া হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীর লেভেল অনুসারে এই বিল পাওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এই বিল পেতেও সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঘুষ প্রদান করতে হয়। এই ঘুষের পরিমাণ সাধারণত ১০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই ঘুষের পরিমাণ আরো বেশি হতে পারে।

৪.১০ আনুষঙ্গিক (কন্টিনজেন্সি) বিলে দুর্নীতি

সিজিএ অফিসের ঘুষ গ্রহণের আর একটি খাত হচ্ছে আনুষঙ্গিক খাত। আনুষঙ্গিক খাতে বিল বাড়িয়ে লেখার সুযোগ থাকায় এজি অফিস এই বিলে সর্বোচ্চ ঘুষ নেওয়ার চেষ্টা করে। যেসব অফিসে আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ কম সেখানে ঘুষ লেনদেনও কম হয়। কিন্তু যেখানে খরচ অনেক বেশি সেখানে ঘুষের লেনদেন প্রচুর। সাধারণত আনুষঙ্গিক বিল পাস করাতে বিলের ১% থেকে ৫% পর্যন্ত সিজিএ অফিসে ঘুষ দিতে হয়। তবে যেখানে বিলের অংক বড় সেখানে অনেক সময় বিলের ৩% থেকে ৭% পর্যন্ত সিজিএ অফিসে ঘুষ দিতে হয়। বড় অংকের অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে জিনিস-পত্র কেনা হলে তা টেন্ডারের মাধ্যমে কেনা হয়। এই বিল পাস করানো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিজেই করে এবং তাদেরকেও একটি নির্দিষ্ট হারে

> **বক্স ১২: কন্টিনজেন্সি বিলে ঘুষ**
> একটি সরকারি অফিসে লাক্স সাবান কেনা হয়। কেনার সময়ে এই সাবানের দাম সারা দেশে প্রতি পিস ১৪ টাকা ছিল। সিজিএ অফিসে ১৪ টাকা দরেই বিল জমা দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিলের জন্যও সিজিএ অফিস ঘুষ দাবি করে। সংশ্লিষ্ট অফিস তখন সিজিএ অফিসকে বুঝিয়ে বলল যে, এখানে কোনো অতিরিক্ত বিল করা হয়নি আপনাকে টাকা দিব কিভাবে। তখন সিজিএ অফিস সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাকে বললেন 'আপনি কোটেশনের মাধ্যমে না কিনে সাবান সরাসরি কেন কিনলেন। যদি কোটেশনের মাধ্যমে সাবান কেনা হত তাহলে সাবানের দাম ১৪ টাকা না হয়ে আরো বেশি হত। কারণ টেন্ডারের মাধ্যমে সাবান কেনা হলে দাম বাড়িয়ে ধরা হত। তখন এই অতিরিক্ত টাকা থেকে আমাকেও কিছু টাকা দিতে পারতেন নিজেও কিছু টাকা নিতে পারতেন। আপনারা যা কিছু করবেন আমাদেরটা রেখে করবেন।'

ঘুষ দিয়ে বিল পাস করাতে হয়। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অনেক সময় ক্যাশ সরকারের মাধ্যমেও তাদের বিল পাস করিয়ে থাকে। যে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কোটেশনের মাধ্যমে কেনা হয় সেগুলোর বিল পাশ করাতে সিজিএ অফিসকে বিলের ৫% এবং যেগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে কেনা হয় সেগুলোর বিল ১ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে বিলে ১% এবং এর অধিক হলে বিলের .২০% থেকে .৫০% পর্যন্ত সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়।

৪.১১ পেনশন পেতে দুর্নীতি

সিজিএ অফিসে পেনশন বিল জমার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি হয়ে চেক প্রদানের নিয়ম রয়েছে। এছাড়াও পেনশনের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাপ্ত অর্থের ৮০% আবেদনের প্রেক্ষিতে পেতে পারে। বাকি ২০% কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অডিট আপত্তি আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করে প্রদান করতে হবে। পেনশন উত্তোলনের জন্য চাকরি বৃত্তান্ত ফরমের সাথে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগপত্র, যোগদানকাল, আঙ্গুলের ছাপ, এলপিসি, টাইম স্কেল প্রাপ্তির কাগজসহ সর্বনিম্ন ৮ থেকে সর্বোচ্চ ১৩টি নথি-পত্র জমা দিতে হয়। মূখ্য তথ্যদাতাদের মতে পূর্বের তুলনায় হয়রানি কিছুটা কম হলেও সিজিএ অফিসে ঘুষ না দিয়ে পেনশন উত্তোলন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, জেলা, উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর (ঘোষিত/অঘোষিত) সারা জীবনের বেতন নির্ধারণ করেছে ও বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছে নিরীক্ষা ও হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ। অথচ চাকরি জীবনের শেষে পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানের প্রাক্কালে তারাই আবার বেতন নির্ধারণী যাচাই করেন। এতে বলা হয়, আপনি 'এত' হাজার টাকা বেশি নিয়েছেন যা ফেরতযোগ্য কিংবা আদায়যোগ্য। আবার মোটা অঙ্কের 'টু' পাইস দিতে পারলে তখন পেনশনের 'ফেরতযোগ্য বা আদায়যোগ্য' থাকে না।[২৮] পেনশন উত্তোলনের জন্য যেসব কাগজপত্র দরকার তা অনেক সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সংগ্রহে রাখে না। ফলে পেনশন উত্তোলনের সময় এই কাগজপত্র তারা সঠিকভাবে জমা দিতে পারে না। আর সিজিএ অফিস এই সুযোগে পেনশনারদের[২৯] হয়রানি করে থাকে।

সিজিএ অফিসের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের একটি বড় খাত হচ্ছে পেনশন বিল। কোনো পেনশনার পেনশন উত্তোলনের পূর্বেই যদি সিজিএ অফিসের সাথে দর কষাকষি করে একটি সমঝোতায় আসতে পারে তাহলে তাদের পেনশন পেতে কোনো হয়রানির সম্মুখীন হতে হয় না। তাদের প্রয়োজনীয় সকল নথি-পত্র সিজিএ অফিসই সরবরাহ করে কম সময়ের মধ্যে পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলেও ঘুষ নিয়ে কোনো সমঝোতায় না পৌছালে সিজিএ অফিস বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দেখিয়ে তা ফেলে রাখে বা আপত্তি তুলে বিল ফিরিয়ে দেয়, সব আপত্তি একসাথে না দিয়ে কয়েকবার করে আপত্তি দিয়ে হয়রানি করে, সার্ভিস রেকর্ডে সমস্যা রয়েছে বলে হয়রানি করে। বিলের ওপরে বিভিন্ন আপত্তি দিয়ে আবার নিজেরাই ঘুষের বিনিময়ে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। আবার ১০ কর্মদিবসের মধ্যে পেনশনের বিল পাস করানোর নিয়ম থাকলেও তা তারা পালন করে না। ১০ কর্মদিবস পূর্ণ হয়নি বোঝানোর জন্য সিজিএ অফিস প্রত্যেকের জন্য টোকেন নম্বর পরিবর্তন করে নতুন তারিখ বসায়। পেনশনের নিয়ম কানুন অনেক সহজ হলেও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাগজে কলমে থাকে এবং খুব কমই বাস্তবায়িত হয়।

গেজেটেড কর্মকর্তাদের থেকে অন্যান্য সময়ে ঘুষ আদায় করার সুযোগ কম পাওয়ায় পেনশনের সময়ে একটি বড় অংকের টাকা সিজিএ অফিস কেটে নেওয়ার চেষ্টা করে। অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর

---

[২৮] জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ২০১০

[২৯] যেসব অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন পাবার যোগ্য

প্রস্তুতিমূলক সময়ে কিছুটা অসহায় বোধ করে। এ সময়ে যেহেতু তিনি আর কোনো অফিসে বসেন না তাই তার পূর্বের ন্যায় ক্ষমতাও থাকে না। তথ্য দাতাদের মতে পেনশন তোলার জন্য এজি অফিসে ঘুষ আগে দিতে হয় পরে তারা কাজ শুরু করে। পেনশন তুলতে সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয় যাদের নিয়োগে অনিয়ম থাকে।

বক্স ১৩: গেজেটেড কর্মকর্তার পেনশন উত্তোলনে হয়রানি ও ঘুষ প্রদান
একজন গেজেটেড কর্মকর্তা মন্ত্রণালয় থেকে পেনশনের অনুমোদন পেয়েছেন ২০১০ সালের ১৭ জুন তারিখে এবং জুলাই মাসের ১৫ তারিখে তিনি চেক পান। তার এই চেক পেতে তাকে ঘুষ প্রদান করার পরেও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এই কর্মকর্তা প্রথমে জুট কর্পোরেশনে ছিল। সেখান থেকে ১৯৮৫ সালে এনাম কমিটির মাধ্যমে পাট অধিদপ্তরে আসে। সিজিএ অফিস এই অধিদপ্তরে আত্মীকরণের চিঠি দেখতে চায়। এছাড়া তার জুট কর্পোরেশনে নিয়োগের বিজ্ঞাপন, মন্ত্রণালয়ের চিঠি, পিএসসি-র কাগজ, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ অনেক কাগজপত্র চেয়ে হয়রানির চেষ্টা করেছে। এরপরে দর কষাকষির মাধ্যমে তাদের ঘুষ প্রদান করা হলেও পেনশনের চেক পাচ্ছিল না। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এই মন্তব্যও করেছে যে, তার আর এই জীবনে পেনশন পাওয়া হবে না। এর পরে ওই কর্মকর্তার এক বন্ধু সিজিএ'র প্রভাবশালী একজন সিএও-র কাছে নিয়ে যান। এই সিএও তাকে বলেন, বাসায় ফিরে যাওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সালাম দিয়ে যেতে। ঐদিন-ই তার পেনশনের চেক পেয়ে যান।

পেনশনের ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ পেনশনে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে ঘুষ কখনও শতকরা হারে আবার কখনো থোক হিসেবে নেওয়া হয়। সাধারণত পেনশন বিলের ১% থেকে ১০% পর্যন্ত সিজিএ অফিসকে ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। আবার থোক হিসেবে ঘুষের লেনদেন হলে ৫০০০ টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্তও লেনদেন হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর পরিমাণ বেশিও হয়ে থাকে।

বক্স ১৪: একজন শিক্ষকের পেনশন উত্তোলনে ঘুষ প্রদান
ঢাকার মিরপুরে একটি স্কুলে কর্মরত একজন শিক্ষক ৩৫ বছর বয়সে ক্যান্সারে মারা যান। তার স্ত্রী পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে অত্যন্ত হয়রানির শিকার হন। বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে তার স্বামীর পেনশনের টাকা তুলবেন। এরকম পরিস্থিতিতে তিনি পেনশন উত্তোলনের জন্য সিজিএ অফিসের এক কর্মকর্তার সাথে পঁচিশ হাজার টাকা ঘুষ দেওয়ার সমঝোতা করেন। এভাবে তিনি তার স্বামীর পেনশনের এক লক্ষ টাকা উত্তোলন করতে সমর্থ হন।

বক্স ১৫: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পেনশন উত্তোলনে ঘুষ প্রদান
একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের এলপিআর শেষে পেনশন তোলার সময় হয়। এই শিক্ষকের দুই ছেলে দুইটি সরকারি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। হয়রানি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পিতার পেনশন তোলার দায়িত্ব তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে বলে ঠিক করেন। প্রথমেই তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, এই পেনশন তোলার জন্য তারা কাউকে কোনো ঘুষ দিবেন না। নিয়ম মাফিক সমস্ত কার্যক্রম শেষ করার পরে চেক উত্তোলনের দিনটি চলে এল। সব কাজ শেষে সিজিএ অফিস থেকে যখন কোনো ঘুষ না দিয়েই চলে আসছিলেন তখন এজি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খুব মন খারাপ হল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, এটা কেমন কথা কোনো টাকা না দিয়েই এতগুলো টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সিজিএ অফিসের এই অবস্থা দেখে ঐ ব্যক্তির ছোট ছেলে রাগ করে ২০০০ টাকা সিজিএ অফিসে দিয়ে আসে। এরমধ্যে ১০০০ টাকা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার জন্য, আর ১০০০ টাকা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য দেওয়া হয়।

আবার পেনশন উত্তোলনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বলে অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে। ক্ষমতার জোর থাকলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না করেও টাকা দিয়ে পেনশন উত্তোলন করা সম্ভব।

বক্স ১৬: অডিট আপত্তি থাকা স্বত্বেও প্রভাব খাটিয়ে পেনশন উত্তোলন

একটি প্রতিষ্ঠান-এর একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার অডিট আপত্তি ছিল, যেগুলো খসড়া অনুচ্ছেদে চলে যায়। ফলে তার পেনশন আটকে ছিল। তার একজন আত্মীয় ছিলেন কর্ণেল। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই কর্ণেল উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করে এবং ঘুষ দিয়ে অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হওয়ার আগেই তিনি তার পেনশন পেয়ে যান। তবে মুখ্য তথ্যদাতা ঘুষের পরিমাণ বলতে পারেননি।

আবার একজন বিভাগীয় প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি ছিল এবং সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার পেনশন উত্তোলন করতে পারেনি। পরবর্তীতে এই প্রকৌশলীর পুত্র যুগ্ম-সচিব হিসেবে একই মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পান। তার উদ্যোগে ঐ প্রতিষ্ঠানে বিভাগীয় প্রকৌশলীর বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু করে। ফলশ্রুতিতে এজি অফিসের সাথে লেনদেনের ফলে ঐ বিভাগীয় প্রকৌশলীর পেনশন উত্তোলন করা সম্ভব হয়েছে।

৪.১২ টাইম স্কেল সংযোজন ও বকেয়া বেতন পেতে দুর্নীতি

সরকারি কর্মচারীরা তাদের চাকরি জীবনের ৮, ১২ এবং ১৫ বছরে একটি করে টাইম স্কেল পায়। এই টাইম স্কেল পেলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বেড়ে যায়। সাধারণত যে মাস থেকে টাইম স্কেল পাওয়ার কথা সে মাসেই সকল কার্যক্রম শেষ না হওয়ার জন্য তা কার্যকর হতে সময় লাগে। এই টাইম স্কেল যতক্ষণ পর্যন্ত সিজিএ অফিস দ্বারা সংযোজন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন স্কেলে বেতন পায় না। এভাবে সমস্ত কার্যক্রম শেষ হতে কখনও কখনও ছয় মাস বা এক বছর পর্যন্ত লেগে যায়। ফলে টাইম স্কেল যখন পেতে শুরু করে ততদিনে কয়েক মাসের বেতনের টাকা একসাথে জমা হয়ে যায়। আর সিজিএ অফিস একসাথে বেতনের এতগুলো টাকার বিল কোনোভাবেই ঘুষ ছাড়া পাস করতে চায়না। এই ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে বকেয়া বেতনের পরিমানের উপর। বেশিরভাগ টাইম স্কেল সংযোজনের জন্য থোক বরাদ্দে ঘুষ লেনদেন হয়। তবে সাধারণত ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়। আবার কখনো টাকার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শতকরা হারেও ঘুষ দিতে হয়। দর কষাকষি বা সুসম্পর্কের ভিত্তিতেও এই টাইম স্কেল সংযোজন হয়ে থাকে। টাইম স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাদের নিয়োগে অনিয়ম কিংবা কোনো সমস্যা রয়েছে তাদের টাইম স্কেল সংযোজনে সময় বেশি লাগে। এ ধরনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত উঠে থাকে।

বক্স ১৭: বকেয়া প্রাপ্তিতে হয়রানি

সিজিএ অফিসে ঘুষ লেনদেনের বিষয়টি এতটাই খোলামেলা এবং ভয়াবহ যে একজন সাবেক সিএজি-র ভাগ্নে ও সিজিএ কর্মচারী এই ঘুষ লেনদেনের থেকে বাদ যেতে পারেনি। সিএজি'র এই ভাগ্নে সিজিএ অফিসের কাজ নিয়ে পদোন্নতি পেয়ে অডিটর হিসেবে লন্ডন যাওয়ার সুযোগ পায়। এই সময়ে বিদেশে পদায়নের জন্য তিনি প্রায় পাঁচ লাখ টাকা পান। এই টাকার বিল যখন সিজিএ অফিসে জমা দেন তখন তার অফিসের একজন সুপার বলেন "আপনি লন্ডন যাচ্ছেন আবার এতগুলো টাকাও পাচ্ছেন। আমাদেরকে কিছু দিয়ে যাবেন না।" এই অডিটর তখন তার মামাকে (সিএজি) এই তথ্য জানান। পরে সিএজি এই বিল পাস করানোর ব্যবস্থা করেন।

টাইম স্কেলের মত চাকরি স্থায়ীকরণেও দুর্নীতি ও হয়রানি হয়। কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময় ঘুষ না দিলে মাসের পর মাস তার চাকরি ঝুলে থাকে। যারা প্রকল্প থেকে এসে স্থায়ীভাবে কোনো অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরে চাকরি করছে তাদের অনেকেরই চাকরি স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান করতে হয়। চাকরি স্থায়ী করার সময় সাধারণত বকেয়া বেতন জমলে কর্মচারীদের নিকট থেকে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা ঘুষ নিয়ে থাকে।

আবার অনেক সময় বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট নিতেও সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়। কারণ বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট এর টাকা বকেয়া হলে অনেকগুলো টাকা একত্রে জমা হয়। আর তখনই সিজিএ অফিস কিছু

হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ খোঁজে। তখন কর্মকর্তারা-কর্মচারীরাও সিজিএ অফিসকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে দ্রুত ইনক্রিমেন্টের টাকা পাওয়ার চেষ্ট করে। ইনক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে সিজিএ অফিস থেকে ক্যাশ সরকার বা পিয়নের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নিকট খবর পাঠায় যে, স্যার/আপাকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু দিতে বলবেন তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে। এরকম মুহূর্তে বকেয়া টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য কর্মকর্তারা ৫০০ বা ১০০০ টাকা মিষ্টি খাওয়া বাবদ ঘুষ দিতে আপত্তি করে না।

৪.১৩ এলপিসি[৩০] নিতে দুর্নীতি

এলপিসি হচ্ছে সর্বশেষ বেতনের সনদ। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়ে যায় তখন পূর্বের স্থানের হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন স্থানের হিসাবরক্ষণ অফিসে এই সর্বশেষ বেতনের সনদ পাঠানো হয়। এই সনদ বদলির এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠানোর নিয়ম রয়েছে। পুরোনো স্থানের সিজিএ অফিসে ঘুষ দেওয়া না হলে তারা এই এলপিসি পাঠাতে দেরি করে। কিংবা না পাঠিয়েও হয়রানি করার জন্য বলে পাঠিয়ে দিয়েছি। অন্যদিকে বদলিকৃত স্থানের সিজিএ অফিস এলপিসি পেয়েও হয়রানি করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিসি না পাওয়ার কথা বলে বেতন বিল পাস না করিয়ে হয়রানি করে। যেহেতু এলপিসি না পাওয়া পর্যন্ত বেতন পাওয়া যায় নয় তাই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অর্থের বিনিময়ে হলেও তার এলপিসি দ্রুত পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। সাধারণত এলপিসি পেতে ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়।

> **বক্স ১৮: এলপিসি নিতে ঘুষ প্রদান**
> স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কর্মরত একজন এমবিবিএস ডাক্তার জেলা পর্যায়ে বদলি হন। বদলি হওয়ার সময় তিনি যাতে তার এলপিসি দ্রুত পাঠানো হয় তার জন্য সিজিএ অফিসে ৩০০ টাকা ঘুষ দিয়ে নতুন জায়গায় যোগদান করতে চলে যান। কিন্তু যোগদানের এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা সিজিএ অফিস থেকে এলপিসি নতুন কর্মস্থলে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও প্রায় এক মাস শেষ হয়ে গেলেও এলপিসি পাঠানো হয়নি। এরপরে ওই ডাক্তার নিজেই আবার সিজিএ অফিসে এলপিসি নেওয়ার জন্য চলে আসেন। এসে সিজিএ অফিসে এলপিসি চাইতে গেলে তাকে অপো করতে বলে। প্রায় তিন ঘন্টা অপো করার পরে তিনি তার এলপিসি হাতে পান। এ সময়েও যিনি এলপিসি ডাক্তারের হাতে তুলে দেন তিনি তার কাছে আর কিছু টাকা দাবী করে। তখন ডাক্তার ওই সিজিএ কর্মচারীকে আবার ৫০ টাকা দেন।

৪.১৪ ঋণ ও জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের একাউন্ট স্লিপ পাঠানো ও এই ফান্ডের টাকা অগ্রিম উত্তোলনে ঘুষ প্রদান

সিজিএ অফিসের নাগরিক সনদ অনুসারে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের একাউন্ট স্লিপ ১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রতিটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বরাবর পৌঁছানোর নিয়ম রয়েছে।[৩১] সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বেশির ভাগ অফিসেই এই জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেয়েছে। তবে অনেক প্রধান

> **বক্স ১৯: জিপিএফ এর টাকা উত্তোলনে ঘুষ প্রদান**
> উপজেলা পর্যায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর কৃষি কর্মকর্তা তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১ লাখ টাকা তুলতে চেয়েছিল। তিনি এই টাকার বিল জমা দিলে তার নিকট সিজিএ অফিস থেকে ৮০০ টাকা ঘুষ চাওয়া হয়। তার এই বিলে কোনো সমস্যা ছিল না। তারপরেও সিজিএ অফিস তার এই বিল পাস করাতে ঘুষ নিয়ে দর কষাকষি করে। অবশেষে এই কর্মকর্তা ৫০০ টাকা ঘুষ দিয়ে তার জিপিএফ এর টাকা উত্তোলন করতে সমর্থ হয়।
> একজন কর্মচারী জিপিএফ এর ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২শ টাকা অগ্রিম উত্তোলন করেন। যেহেতু তিনি জানেন যে সিজিএ অফিসে ঘুষ না দিলে তার এই টাকা উত্তোলন করতে অনেক হয়রানির শিকার হতে হবে তাই তিনি হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য এবং তার কাজ সুষ্ঠুভাবে করানোর জন্য সিজিএ অফিসে ৫০০ টাকা ঘুষ দিয়ে দ্রুত তার বিল পাস করিয়ে নিয়ে আসেন।

---

[৩০] কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি হলে তার চাকরি কালীন সকল হিসাব এই সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকে যা পূর্বের অফিস থেকে স্থানান্তরিত অফিসে পাঠানো হয়

[৩১] সিটিজেন চার্টার, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের অফিস, www.mof.gov.bd

হিসাবরক্ষণ অফিস জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ কখনওই নিজ থেকে পাঠায় হয় না। কোনো কোনো অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদের এসে স্লিপ নিতে হয়। মুখ্য তথ্যদাতার মতে কেউ যদি জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে সময়ে নিতে চায় তাহলে সিজিএ অফিস ঘুষ বা বকশিস দাবি করে। সিজিএ অফিস থেকে নিয়ম মাফিক না পেয়ে কেউ যদি নিজে থেকে জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ নিতে যায় তাহলেই তাকে এর জন্য সিজিএ অফিসে বকশিস বা ঘুষ দিতে হয়। সাধারণত জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ নেওয়ার জন্য ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়। সিজিএ অফিসে বিভিন্ন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস ঘুরে দেখা গেছে একটি রুমে প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন কর্মচারী তাদের বিভিন্ন কাজ নিয়ে সিজিএ অফিসে ঘোরাঘুরি করছে। তাদেরকে জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পান কিনা এ প্রশ্ন করা হলে তারা সকলেই জানান যে কখনই সিজিএ অফিস থেকে জিপিএফ স্লিপ পাঠানো হয় না। সব সময়ই নিজে থেকে এসে নিয়ে যেতে হয় এবং নেওয়ার সময়ে ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা দিতে হয়।

কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী তার জিপিএফ এর জমানো টাকার সর্বোচ্চ ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ টাকা অগ্রিম তুলতে পারে। সিজিএ অফিসের নিয়ম অনুসারে জিপিএফ ব্যালান্স স্থানান্তর ও জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলন বা চূড়ান্ত পরিশোধ বিল জমা দেওয়ার তারিখ থেকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু এই টাকা উত্তোলনে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে সিজিএ অফিসকে ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষ অগ্রীম অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত ৫০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বেশিও হয়ে থাকে।

৪.১৫ অন্যান্য কাজ করাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

বক্স ২০: কনসালটেন্ট এর বিলে ঘুষ প্রদান
একটি সরকারি বিভাগে কনসালটেন্টদের মোট সাত লক্ষ টাকার বিল সিজিএ অফিসে পাসের জন্য জমা দেওয়া হয়। এই বিল সিজিএ অফিস দিনের পরদিন পাস না করিয়ে ফেলে রাখে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ হয়নি, এই জায়গায় দারি দেওয়া হয়নি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বিল ঝুলিয়ে রাখে। এরপর এই কনসালটেন্টরা সিজিএ অফিসকে বিল পাস করানো বাবদ ১০,০০০ টাকা ঘুষ দিলে বিলটি দ্রুত পাস হয়ে যায়।

উপরের খাতগুলো ছাড়াও সরকারি কর্মকর্তারা-কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন বিল বা অন্যান্য কাজ করানোর জন্য সিজিএ অফিসে গিয়ে থাকে। এসব বিলের মধ্যে রয়েছে কনসালটেন্ট বিল, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ক্যাশ করানো, পোশাক ভাতা ইত্যাদি। এই বিল পাস করাতেও সিজিএ অফিসকে ঘুষ প্রদান করতে হয়। যেসব অফিসে কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে কাজ করানো হয় সেসব অফিসের এই কনসালটেন্ট এর বিল পাস করাতে বিলের ১০% থেকে ১৫% টাকা ঘুষ দিতে হয়।

বক্স ২১: বিনোদন ছুটি ক্যাশ করাতে ঘুষ প্রদান
একজন ডাক্তার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা। তার বিনোদন ছুটি ক্যাশ করানোর জন্য বিল জমা দেন। তার এই বিলে কোনো অনিয়ম বা সমস্যা ছিল না। বিল জমা দিয়ে দ্রুত পাস করার জন্য একজন কর্মচারীকে অনুরোধ করল। কর্মচারী বিলটি পাশ করে ডাক্তারের হাতে চেক তুলে দিল। ডাক্তার যখন চেক নিয়ে বেরিয়ে আসছিল তখন সিজিএ কর্মচারী ডাক্তারকে বললেন 'ভাই কিছু দিবেন না।' লজ্জায় পরে ওই কর্মকর্তা ৫০ টাকা ঘুষ দিয়ে বেড়িয়ে অসে।

সরকারি নিয়ম অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতি তিন বছর পর পর ১৫ দিনের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে। যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই ছুটি ভোগ না করে তারা এই ১৫ দিনের (ছুটি ক্যাশ) বেতন অতিরিক্ত উত্তোলন করাতে পারে। এই ছুটি ক্যাশ করানোর জন্য সিজিএ অফিসের মাধ্যমে বিল পাস করাতে হয়। কিন্তু সিজিএ অফিস থেকে কখনই তা ঘুষ ছাড়া পাশ করা সম্ভব হয় না। এই ছুটি ক্যাশ করাতে সাধারণতঃ ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। তবে কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই ঘুষের পরিমাণের হেরফের হয়ে থাকে।

সরকারি অফিসের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি ৩ বছর পর পর পোশাক বাবদ ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই পোশাকের টাকা উত্তোলনের জন্য কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সিজিএ অফিসে ঘুষ প্রদান করতে হয়। কোনো কোনো অফিসে এই ঘুষের পরিমাণ বিলের ১০%। যেসব অফিসে এই পোশাক তৈরি কোনো কোম্পানির মাধ্যমে করা হয় সেসব অফিসের ক্ষেত্রে কোম্পানি এই ঘুষ প্রদান করে থাকে।

বেতন বিল পাস করাতে গেলে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য একটি টোকেন নম্বর দেওয়া হয়। এই টোকেন নম্বরটি বিল কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পরে দেওয়া হয়। কম্পিউটারে এই বিল এন্ট্রি করতে ১০ থেকে ২০ টাকা দিতে হয়। আবার যখন চেক ডেলিভারী দেওয়া হয় তখনও অনেক হয়রানির শিকার হতে হয়। কোনো বিল কম্পিউটারে এন্ট্রি ও চেক ডেলিভারির জন্য ২০ থেকে ৫০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। আবার কখনও ১০টি বিল এন্ট্রি করতে মোট ১০০ টাকা দিতে হয়। কোনো কোনো অফিস থেকে জানা যায় যে কম্পিউটারে এন্ট্রি ও চেক ডেলিভারীর ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে না হলেও চা পানির পয়সা দিতে হয়। কখনও কখনও দেখা গেছে যে এন্ট্রি করতে অনেক সময় নেওয়ার কারণে সিজিএ অফিসে যাতায়াতকারী ক্যাশ সরকার বা হিসাবরক্ষক নিজেই বিল কম্পিউটারে এন্ট্রি করে।

উপরের খাতগুলো ছাড়াও সিজিএ অফিসকে অনেক ধরনের কাজের জন্য বকশিস বা ঘুষ প্রদান করতে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের হিসাবের ভুল সংশোধন করা। প্রতিটি কর্মচারীর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য বিভিন্ন বিষয়ে ভুল

৪.১৬ সিজিএ অফিসের ঘুষ নেওয়ার সার্বিক চিত্র

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, সিজিএ অফিসকে নিম্নলিখিত খাতগুলোয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগগুলোকে ঘুষ প্রদান করতে হয়।

সারণি ৪.৩: সিজিএ অফিসের ঘুষ নেওয়ার সার্বিক চিত্র

ক্রমিক নম্বর	ঘুষ প্রদানের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
১	নতুন বেতন স্কেল সংযোজন করাতে	২০-২০০০ টাকা
২	প্রথম বেতন পেতে	১০০-২০০ টাকা
৩	বোনাস পেতে	১০০-২০০ টাকা
৪	ঠিকাদারের বিল পেতে	বিলের ০.২০%- ১০%
৫	গাড়ির তেল/গ্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণে বিল পেতে	বিলের ১% - ১০%
৬	ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিল পেতে	বিলের ২%
৭	কুরিয়ার বিল পেতে	বিলের ১%-৫%
৮	শ্রমিক মজুরির বিল পেতে	বিলের ১%
৯	টিএ, ডিএ বিল পেতে	বিলের ১% - ১০% বা ৫০ -১০০০ টাকা
১০	কন্টিনজেন্সি বিল পেতে	বিলের ০.২০% - ৭%
১১	পেনশন পেতে	বিলের ১% - ১০%
১২	টাইম স্কেল সংযোজন করাতে	৩০০-১০০০ টাকা
১৩	কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণে	৫০-১০০ টাকা

(চলমান...)

ক্রমিক নম্বর	ঘুষ প্রদানের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
১৪	বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট পেতে	৫০০-১০০০ টাকা
১৫	এলপিসি পেতে	১০০-৫০০ টাকা
১৬	জিপিএফ একাউন্ট স্লিপ পেতে	২০-১০০ টাকা
১৭	জিপিএফ এর টাকা অগ্রিম উত্তোলনে	৫০০-৫০০০ টাকা
১৮	কনসালটেন্ট এর বিল পেতে	বিলের ১০%-১৫%
১৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেতে	৫০-২০০ টাকা
২০	পোশাক ভাতা পেতে	বিলের ১০%
২১	কম্পিউটারে বিল এন্ট্রি করাতে	১০-২০ টাকা
২২	চেক ডেলিভারি করাতে	২০-৫০ টাকা
২৩	ভুল সংশোধন	৫০-৫০০ টাকা

৪.১৭ ঘুষ নেওয়ার কারণ হিসেবে সিজিএ অফিসের ব্যাখ্যা

সিজিএ অফিস সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে ঘুষ নেয় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে সিজিএ অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা স্বীকার করে এবং এই ঘুষ নেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। তাদের মতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিল পাস করাতে ঘুষ নেওয়া হয় সেসব সেবাগ্রহীতা অফিস বা ব্যক্তির হিসাবে নিশ্চয়ই কোন গড়মিল থাকে। এসব অফিস ঘুষ দিয়ে তাদের বড় বড় দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎ-এর ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। সিজিএ অফিসের কর্মকর্তাদের অজুহাত হচ্ছে এই যে, মূলত সেবাগ্রহীতা অফিসসমূহ তাদের অবৈধ আয়ের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সিজিএ অফিসকে ঘুষ প্রদান করে।

সেবাগ্রহীতা অফিসগুলো তাদের যেকোনো কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া আছে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না। ফলে দ্রুত কাজ করানোর জন্য তারা ঘুষ দিয়ে থাকে। আবার কোনো কাজ করানোর জন্য হয়তোবা সেবাগ্রহীতাকে সিজিএ অফিসে একাধিক বার যেতে হয়। এই একাধিকবার যেতে কোনো ব্যক্তিকে যাতায়াত বাবদ খরচসহ সময় ব্যয় করতে হবে। সেক্ষেত্রে তারা এই অর্থ ও সময় ব্যয় থেকে অব্যাহতির জন্য ঘুষ দিয়ে দ্রুত কাজ করিয়ে নেয়। সিজিএ অফিসের মতে অডিটররা সরকারি অর্থের খুব সামান্য অংশ পায়, বেশিরভাগ অর্থ আত্মসাৎ করে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

সিজিএ অফিসে প্রয়োজনের তুলনায় যেহেতু জনবল কম সেহেতু তারাও যেসব কাজ করলে ঘুষ পাওয়া যায় সেসব কাজ আগে করার চেষ্টা করে।

সিজিএ অফিস থেকে ঘুষ নেওয়ার আরও একটি কারণ উল্লেখ করা হয়। এই অফিসে বিল পাস করানোর জন্য সাধরণতঃ সরকারি অফিসগুলোর ক্যাশ পিওন, ক্যাশ সরকারদের পাঠানো হয়। যেহেতু সিজিএ অফিস ঘুষ নেয় এটা সবাই জানে এবং ক্যাশ সরকারই বিল সংক্রান্ত বিষয় সিজিএ অফিসের সাথে লেনদেন করে সেহেতু সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা তার কথাই বিশ্বাস করে। এই ক্যাশ সরকার অনেক সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে সিজিএ অফিসের নাম করে অর্থ আদায় করে যা সিজিএ অফিস জানে না। আবার হয়তোবা সিজিএ অফিসে যে পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় ক্যাশ পিওন, ক্যাশ সরকাররা তার থেকে বেশি ঘুষের কথা বলে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে আদায় করে।

কোনো কাজ করার জন্য সিজিএ অফিসে যদি পাঁচবার যেতে হয়, আর প্রতিবার যেতে ১০ টাকা করে খরচ হয়, তাতে মোট একশ টাকা খরচ হয়, সাথে অনেক সময়ও নষ্ট হয়। তার চেয়ে সিজিএ অফিসে একবার একশ টাকা দিয়ে কাজ করাতে পারাটা অনেক সহজ। তাই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজ থেকেই ঘুষ দিয়ে দেয়।

বক্স ২৩: জেলা পর্যায়ের হিঃ রঃ অফিসের দুর্নীতির চিত্র সারাদিন এই অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে বিভিন্ন বিল পাস ও অন্যান্য কাজ করা বাবদ ঘুষ আদায় করে। দিন শেষে এই টাকা একত্র করা হয়। এরপরে এই টাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ অনুসারে ভাগ করে খামে ভরে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দিয়ে দেওয়া হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সিজিএ অফিসের সকল কার্যক্রম ঘুষের বিনিময়ে সম্পন্ন করতে হয়। উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে সিজিএ অফিস কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত। দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, হাইপেন, ফুলস্টপ, লেখা স্পষ্ট নয়, লেখায় কাটাকাটি হওয়া ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে 'ফেরত স্মারক' মাধ্যমে আপত্তির পরে আপত্তি তুলে হয়রানি করে। আবার ঘুষ প্রদান করলে কোনো সমস্যাই সমস্যা থাকে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিতে যোগদান থেকে শুরু করে পেনশন উত্তোলন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়। গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ২৩টি খাতে সিজিএ অফিসকে ঘুষ প্রদান করতে হয়। এছাড়াও সিজিএ অফিস দ্বারা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রকল্পের ঠিকাদাররা বিভিন্নভাবে হয়রানিরও শিকার হয়। কখনও কখনও ঘুষ প্রদান করার পরেও তাদের দিনের পর দিন ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তবে সিজিএ অফিসের দুর্নীতির পেছনে সরকারি বিভাগগুলোর ভূমিকাও উল্লেখ করতে হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি অফিসগুলো নিজের স্বার্থ রক্ষা ও দুর্নীতি ঢাকার জন্য সিজিএ অফিসকে ঘুষ প্রদান করে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিসাব রক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা

দক্ষ হিসাবরক্ষণ যেকোনো সংস্থার যথার্থ আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুরনো ম্যানুয়্যাল পদ্ধতির হিসাব ব্যবস্থায় হিসাব কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের দাবীকৃত অর্থ গ্রহণে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। শতাব্দী পুরনো এবং ক্যাশ ভিত্তিক[৩২] হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করার ফলে এদেশের হিসাব ব্যবস্থায় যথাযথ নির্ভুল হিসাব বিবরণ তৈরী সম্ভব হয় না এবং সেই সাথে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কোনো দাবী পেতে দীর্ঘ সময় এবং ভোগান্তির শিকার হয়। সময়মত, নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য, আর্থিক ঘাটতিসমূহ মনিটর করা, ক্যাশ ফ্লো সম্পর্কে আগাম তথ্য দেয়া, সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা করা এবং দক্ষ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর্থিক বিবরণ তৈরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা বাংলাদেশের সরকারি আর্থিক বিবরণীতে পাওয়া সম্ভব হয় না। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ তাদের হিসাব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছে বা অনেকে সংস্কার সাধনের পথে রয়েছে। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের হিসাব বিবরণী কি রকম হওয়া প্রয়োজন তা দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিসাব ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা প্রয়োজন। নিম্নে উপমহাদেশের ভারত. পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং বিশ্বের কম দুর্নীতিগ্রস্ত দুইটি দেশ নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশের চিত্র তুলে ধরা হলো।

৫.১ ভারতের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্রিটিশ হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। একাউন্ট কোড, ফিন্যান্সিয়্যাল কোড, ট্রেজারি রুলস্, ডিপার্টমেন্টাল একাউন্টস্ রুলস্ এর মাধ্যমে ভারতের হিসাব ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ভারতের বর্তমান হিসাব ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়সমূহে বিকেন্দ্রীভূত। এ সকল মন্ত্রণালয়ের একাউন্টস্ ইউনিট সমূহের প্রধান থাকে চীফ কন্ট্রোলার অব একাউন্টস (সিসিএ) অথবা কন্ট্রোলার অব একাউন্টস (সিএ) যারা সিজিএ'র নিকট রিপোর্ট করে। সিসিএ/সিএ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টস অফিসের মাধ্যমে কাজ করে। সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে বহু পে এন্ড একাউন্টস অফিসার রয়েছে যারা সরকারের পক্ষে পেমেন্ট করেন এবং রাজস্ব আদায় করেন। এই সকল কর্মকর্তাগণ সমন্বিত তহবিল, কন্টিনজেন্সি ফান্ড এবং পাবলিক ফান্ড রক্ষণাবেক্ষণ করে। সিজিএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সরকারের বার্ষিক হিসাব (ইউনিয়ন সরকারের আর্থিক হিসাব এবং এপ্রোপ্রিয়েশন হিসাব অন্তর্ভূক্ত করে) সিএজি কর্তৃক অডিট করার পর তা সংসদে পেশ করা হয়। বিগত দু দশক ধরে হিসাব ব্যবস্থায় ভারত সরকারের ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ভারতের বর্তমান হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা হলো ক্যাশ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা। তবে সরকার কিছু নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যা অ্যাক্রুয়াল হিসাব[৩৩] ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

ভারতে ১৯৭১ এ কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল এ্যাক্ট পাশ হয়। সেখানে অডিট থেকে একাউন্টস কে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা আছে। এই এ্যাক্ট এর সেকশন ১০ এ সিএজি কে ইউনিয়ন সরকারের

[৩২] যে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে শুধু নগদ ভিত্তিতে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা হয় যেখানে আয়-ব্যয় যখনই হোক না কেন নগদ যখন আয় ব্যয় হয় সে সময়ের ভিত্তিতেই হিসাবরক্ষণ করা হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৪

[৩৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৪

যেকোনো ডিপার্টমেন্টের হিসাব সংকলনে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতায়ন করা হয়। ১৯৭৫ এ অডিট থেকে একাউন্ট আলাদা করার বিষয়টি ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদন পায়। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একটি অধ্যাদেশ পাশ হয় যা কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (ডিপিসি) এ্যাক্ট ১৯৭১ সংশোধন করে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে সিএজিকে ভারত সরকারের মন্ত্রনালয়/ডিপার্টমেন্টের হিসাব সংকলনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তবে প্রত্যেকটি প্রদেশে সিএজিকেই একাউন্টস্ এবং অডিট কার্যক্রম পালন করে।

৫.২ পাকিস্তানের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের মত পাকিস্তানও পুরনো ম্যানুয়াল হিসাব ব্যবস্থা, যা মূলত বৃটিশ এবং পরবর্তীতে ভারত কর্তৃক ব্যবহৃত ছিল তা অনুসরণ করে আসছে। এছাড়া এখানেও ক্যাশ বেসিস একাউন্ট মেনে চলা হয়। যার ফলে এখানেও হিসাব ব্যবস্থায় সময়মতো যথাযথ নির্ভুল হিসাব বিবরণ তৈরী সম্ভব হচ্ছিলো না এবং এখানেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দাবীকৃত অর্থ গ্রহণে নানা রকম সমস্যা ও হয়রানির শিকার হয়। এ অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত পাকিস্তানেও হিসাব ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একাউন্টিং এবং অডিট ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজ করার উদ্দেশ্যে প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেনট টু ফিন্যান্সিয়াল রিপোটিং এন্ড অডিটিং (পিফরা) চালু করা হয় এবং এখানে কম্পিউটারাইজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পিফরা কার্যক্রমের অন্যতম সেক্টর সমূহ হলো আর্থিক হিসাব এবং বাজেট ব্যবস্থা (ফ্যাবস), সরকারি অডিট, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা। পুরনো হিসাব ব্যবস্থার স্থলে পিফরা নিউ একাউন্টিং মডেল (ন্যাম) স্থাপন করে। এটি মূলত মোডিফাইড ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা।[৩৪] ন্যাম এর প্রধান বৈশিষ্ট/আলোচ্যবিষয় হলো, সমন্বিত বাজেট এবং ব্যয় প্রবাহ, সময়মত এবং নির্ভুল প্রতিবেদন, ক্যাশ সম্পর্কিত আগাম বার্তা, আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা, সম্পদের তথ্য এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ রেকর্ড করা। হিসাব ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে পিফরা জাতীয় পর্যায়ে সময়মত বাজেট এবং ব্যয়ের তথ্যের সমন্বয়করণ এবং নির্ভুল আর্থিক প্রতিবেদন এর ওপর জোর আরোপ করছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেলারি নেটওয়ার্কেও সমন্বয়, সিস্টেমের মাধ্যমে পেনশন এর হিসাব করা, ব্যক্তিগত তথ্য একত্রীকরণ, সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর হিসাব হালনাগাদ করা এবং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফান্ড এর হিসাব গণনা করাও এই পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব হবে। সিন্ধু প্রদেশে ইলেক্ট্রনিক্যালি জেনারেটেড চেক সিস্টেম চালু হয়েছে। আস্তে আস্তে সব প্রদেশে তা চালু করা হচ্ছে।

৫.৩ শ্রীলংকার হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

শ্রীলংকার হিসাব ব্যবস্থা ব্রিটিশ হিসাব ব্যবস্থা হতে অনুপ্রাণিত এবং অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্ঠা চলছে। ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন এর নিকট হতে স্বাধীনতা পাবার পরও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত শ্রীলংকার আর্থিক প্রতিবেদন এর প্রাথমিক ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ আইন। ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব শ্রীলংকা (আইসিএএসএল) ১৯৭০ সালে সর্ব প্রথম শ্রীলংকান একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (এসএলএএস) ইস্যু করে। আশির দশকের শেষ দিকে এবং নব্বই দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবার কারণে অনেক আমানতকারী তাদের সঞ্চয় (সেভিংস) হারায় এবং সরকার কিছু আর্থিক ব্যয়ের (ফিসকাল কস্ট) দায়গ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে আর্থিক সেক্টর শক্তিশালী করণে সরকার প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশন অন ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করে। এ কমিশন আন্তর্জাতিক একাউন্টিং এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করার এবং আর্থিক রিপোর্টিং গুলো মনিটর করার সুপারিশ করে। এ ভিত্তিতে সরকার এবং আর্থিক সেক্টরের বিভিন্ন অভিজ্ঞ ও

---

[৩৪] যে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে ডাবল এন্ট্রি বুক কিপিং সিস্টেম, রেকর্ডিং অব কমিটমেন্টস্, ফিক্সড এসেট রেকর্ডিং করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌথভাবে শ্রীলংকা একাউন্টিং এন্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্ এ্যাক্ট (নং ১৫) ১৯৯৫ তৈরী করা হয়। এই এ্যাক্ট কিছু এন্টারপ্রাইজকে স্পেসিফাইড বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস (এসবিই) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এবং এসবিই'র আর্থিক স্টেটমেন্ট তৈরী, উপস্থাপন এবং অডিট পরিচালনা করে। একই সাথে এই এ্যাক্ট শ্রীলংকা একাউন্টিং এন্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্ মনিটরিং বোর্ড (এসএলএএএসএমবি) প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীলংকার হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনাকারী আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগতভাবে অনেকটা সরকারের হস্তক্ষেপ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ এর মিশ্র প্রতিফলন।

শ্রীলংকান সরকারি সংস্থাসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ক. মন্ত্রণালয়, ডিপার্টমেন্ট এবং সাংবিধানিক বডি (অডিটর জেনারেল এর ডিপার্টমেন্ট সহ), খ. অ-রাজস্ব খাতভুক্ত সংবিধিবদ্ধ বডি এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ও গ. রাজস্ব খাতভুক্ত সংবিধিবদ্ধ বডি এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ। দ্যা শ্রীলংকান একাউন্টিং এন্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড এ্যাক্ট (নং. ১৫) ১৯৯৫ অনুযায়ী, গ গ্রুপ শ্রীলংকান একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী রিপোর্ট করবে। ক এবং খ গ্রুপ অর্থ মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত ফিন্যান্সিয়াল রেগুলেশনস্ (১৯৯২) অনুযায়ী রিপোর্ট করে। এই গ্রুপ গুলোকে ক্যাশ ভিত্তিতে বাজেট তৈরী এবং আর্থিক রিপোর্ট তৈরী করতে হয়। বর্তমানে সরকার পাবলিক এক্সপেনডিচার ম্যানেজম্যান্ট রিফর্ম প্রোগ্রাম এর অংশ হিসেবে অ্যাক্রুয়াল বাজেটিং এবং একাউন্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তন বিবেচনা করছে। ২০০২ সাল হতে স্টেট একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট ক্যাশ ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইপিএসএএস) অনুযায়ী বার্ষিক হিসাব তৈরী করছে এবং অডিটর জেনারেল ঐ হিসাব প্রত্যয়ন করছে। এখানে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইপিএসএএস) ব্যবহার করে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

৫.৪ যুক্তরাজ্যের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যের পাবলিক ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম এজেন্ডার অংশ হিসেবে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। এখানে উত্তরণের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর এপ্রিল ২০০১ এ ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম এজেন্ডার অংশ হিসেবে প্রথম রিসোর্স একাউন্টিং এন্ড বাজেটিং (র‍্যাব) পরিপূর্ণ প্রায়োগিক রূপ লাভ করে। এই র‍্যাবের মাধ্যমে এখানে হিসাব ও বাজেট ব্যবস্থা ক্যাশ ভিত্তিক থেকে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক করা হয়। এই র‍্যাব যুক্তরাজ্যের সরকারের একাউন্টিং এবং বাজেটিং এ অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিফলন ঘটায়, যা ইনপুটের চেয়ে আউটপুটের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। "রিসোর্স একাউন্টিং" শুধুমাত্র ক্যাশ থেকে অ্যাক্রুয়াল এ যাবার কৌশল নয়; এটি এমন একটি কৌশল যা জনসাধারণের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পনার একটি ভিত্তি হিসেবে তথ্য প্রদান করে।

৫.৫ নিউজিল্যান্ডের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা

নিউজিল্যান্ড সরকার বিগত দশকের প্রথম দিকে অ্যাক্রুয়াল একাউন্ট ব্যবস্থা চালু করে। নিউজিল্যান্ডের আর্থিক বিবরণে অপারেটিং স্টেটমেন্ট, আর্থিক অবস্থানের বিবরণ এবং ক্যাশ ফ্লো এর বিবরণ অন্তর্ভূক্ত থাকে। অপারেটিং স্টেটমেন্ট এ রাজস্ব আয় এবং সরকারের ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়। মোট আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্যকে ঐ বছরের অপারেটিং ব্যালেন্স বলে। আর্থিক অবস্থান বিবরণে (ব্যালেন্স শীট) সম্পদ এবং দায় এর চিত্র তুলে ধরা হয়। সম্পদ এবং দায় এর পার্থক্যকে ক্রাউন ব্যালেন্স বলে যা সরকারের নীট মূল্য/সম্পত্তি ধরা হয়। ক্যাশ ফ্লো বিবরণে ক্যাশের নীট প্রবাহ (অপারেটিং, বিনিয়োগ এবং আর্থিক কার্যক্রমে) তুলে ধরা হয়। এই তিন ধরণের বিবরণই একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদেশে এ ধরনেরই একটি হিসাব ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

উপরের পাঁচটি দেশের আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের চিত্র প্রায় একই রকম। এই দেশগুলোর প্রতিটি দেশেই সরকারের সমস্ত ব্যয় পূর্বে অডিট করে সিজিএ অফিসের মাধ্যমে পাশ হয়। অডিট এবং একাউন্ট বিভাগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভারতের কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে আলাদা রয়েছে কিন্তু প্রদেশগুলোতে একই সাথে রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপেও অডিট এবং একাউন্ট আলাদা[৩৫] যেখানে বাংলাদেশে আলাদা হলেও সাংবিধানিকভাবে একই সাথে রয়েছে। আবার শ্রীলংকা, পাকিস্তানের হিসাব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যেখানে ভারতের হিসাব ব্যবস্থা কেন্দ্রে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হলেও প্রদেশগুলোর সবগুলো স্বয়ংক্রিয় নয়। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা বিভাগীয় শহর ও জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

সারণি ৫.১: বিভিন্ন দেশের হিসাবরক্ষণ অফিসের কাঠামোগত তুলনামূলক চিত্র

দেশের নাম	প্রি অডিট করা হয় কিনা	অডিট এবং একাউন্ট আলাদা কিনা	হিসাব ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় কি না
ভারত	হ্যাঁ	কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে	কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়
		আলাদা। কিন্তু প্রদেশে একই সাথে	কোনো কোনো প্রদেশে স্বয়ংক্রিয়
			কোনো কোনো প্রদেশে ম্যানুয়াল
পাকিস্তান	হ্যাঁ	আলাদা	স্বয়ংক্রিয়
শ্রীলংকা	হ্যাঁ	আলাদা	স্বয়ংক্রিয়
নিউজিল্যান্ড	না	আলাদা	স্বয়ংক্রিয়
যুক্তরাজ্য	না	আলাদা	স্বয়ংক্রিয়
বাংলাদেশ	হ্যাঁ	আলাদা (কার্যকর অর্থে নয়)	আংশিক স্বয়ংক্রিয়

অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য উপমহাদেশের দেশগুলোর তুলনায় হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। এসব দেশে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশগুলোর মত। এখানে সমস্ত হিসাব ও বাজেট স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় প্রিঅডিটের প্রয়োজন হয়না। এ সকল দেশে বিভিন্ন সেবা ও অন্যান্য কাজ করার জন্য বিভিন্ন এজেন্সি ও ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে এসব এজেন্সি এবং ডিপার্টমেন্টগুলো তাদের নিজস্ব হিসাব নিজেরা সম্পন্ন করে সরকারের হিসাবরক্ষণ বিভাগে প্রদান করে।

আবার ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিটি দেশেই হিসাবরক্ষণ করা হয় ক্যাশ ভিত্তিক ব্যবস্থায়। তবে ভারতের চারটি রাজ্যে পাইলট বেসিসে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা প্রয়োগের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড পৃথক পৃথক এজেন্সি ও ডিপার্টমেন্টের জন্য ও সমন্বিত হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯৯২ সাল থেকে এবং বাজেটের ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সাল থেকে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণ করছে। অস্ট্রেলিয়ায় পৃথক পৃথক এজেন্সি ও ডিপার্টমেন্টের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে সমন্বিত হিসাব রক্ষণের জন্য ১৯৯৭ থেকে এবং বাজেটের জন্য ২০০০ সাল থেকে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবহার করে আসছে। আর যুক্তরাজ্যে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ হচ্ছে এজেন্সি ও ডিপার্টমেন্টের জন্য ২০০০ সালে, সমন্বিত হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে ২০০৬ সাল থেকে এবং বাজেটের ক্ষেত্রে ২০০২ সাল থেকে। মূখ্য তথ্যদাতাদের মতে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকার কারণে এখনও অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাবের চিন্তা করা হচ্ছে না।

[৩৫] Bangladesh; Financial Accountability for Good Governance, The World Bank, Washington, D.C., 2002

সারণি ৫.২: বিভিন্ন দেশের হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র[৩৬]

দেশের নাম	হিসাব রক্ষণের ধরন (ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব/অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব)
ভারত	বেশির ভাগ প্রদেশে ক্যাশ ভিত্তিক। পরীক্ষামূলক ভাবে চারটি প্রদেশ তামিল নাড়ু, মহারাষ্ট্র,
	উত্তর প্রদেশ এবং কর্ণাটকে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব প্রচলন করা হয়েছে
পাকিস্তান	ক্যাশ ভিত্তিক তবে পরিবর্তিত মোডিফাইড ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব প্রচলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে
শ্রীলংকা	ক্যাশ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ তবে ধীরে ধীরে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে
নিউজিল্যান্ড	অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব
অস্ট্রেলিয়া	অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব
যুক্তরাজ্য	অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব
বাংলাদেশ	ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব। অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব নিয়ে এখনও কোনোরকম পরিকল্পনা নেই

৫.৬ বাংলাদেশে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব রক্ষণের বাধাসমূহ

বাংলাদেশে অ্যাক্রুয়াল হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির কিছু সমস্যা বা বাধা রয়েছে যেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- বিপুল/বৃহদাকারের জনসংখ্যা এবং এ সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ
- হিসাবের প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট সংখ্যক পেশাগত হিসাব রক্ষক না থাকা
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রুয়াল হিসাব ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার জ্ঞানের অভাব
- সারা দেশে এই হিসাব ব্যবস্থা প্রয়োগে প্রয়োজনীয় কাঠামোর অভাব
- শতাব্দী পুরনো ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে নতুন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করার মত মানসিকতার অভাব
- অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও সুযোগ সুবিধার অভাব
- সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মরত থাকা এবং তাদের জবাবদিহিতার অভাব

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে এদেশের জনগণের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আসবে না, সঠিকভাবে পরিকল্পনা নেওয়া যাবে না এবং উন্নয়ন ব্যহত হবে।

[৩৬] বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ৫ এ বিভিন্ন দেশের হিসাব রক্ষণের তুলনামূলক চিত্র দেখুন

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সুশাসন। আর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশই সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। দুর্নীতি রোধ, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সিজিএ অফিসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একমাত্র সিজিএ অফিসের মাধ্যমেই জনপ্রশাসনের শতভাগ আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এবং সরকারের অর্থ সরকারি নিয়ম মেনে ব্যয় হচ্ছে কি না তা যাচাই-বাছাই করা হয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সিজিএ অফিস বিভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করছে যে কারণে সিজিএ অফিস সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঠিকভাবে ও মানসম্মত সেবা প্রদান করতে পারছে না।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে জনবলের অভাবে স্টাফদের কাজের চাপ অনেক বেশি থাকে, অন্য অফিসের কর্মচারীদের দ্বারা ভুল এবং মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করানো হয়, নিজেদের ইচ্ছামত প্রাধ্যান্য সেট করে কাজ করে ও কাজের মনিটরিং করতে পারে না। আইন-কানুন হালনাগাদ না হওয়ায় তা পালন করা সিজিএ অফিসের পক্ষ থেকে যেমন সম্ভব নয় তেমনি সরকারি বিভিন্ন বিভাগগুলোও তা পালন করতে না পেরে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে, অডিট আপত্তি মিটছে না, সরকারি বিভাগগুলোর সাথে সিজিএ অফিসের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কর্মচারীদের পদোন্নতি, আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় তাদের কাজের প্রতি অনিহা তৈরি হচ্ছে, দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। এই অফিসের লজিস্টিক সাপোর্টের অভাবে কাগজপত্র, রেজিস্টার ফাইলপত্র সঠিকভাবে সরক্ষণ করা যাচ্ছে না, তথ্য পেতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।

আবার এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি বা অনিয়মের বিচার প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ, সিবিএর প্রভাব এবং দুর্বল মনিটরিং এর জন্য তারা খুব সহজেই দুর্নীতি করে পার পেয়ে যায়। সরকারি অফিসগুলোর জুন মাসের মধ্যে অর্থ খরচের প্রবনতার কারণে সিজিএ অফিসগুলো এসময়ে ঘুষের বিনিময়ে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই না করে অনেক বিল পাশ করিয়ে দেয়। ফলে হিসাব করতে গিয়ে অনেক ভুল ধরা পরে। এই হিসাব পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মিলানোর কথা থাকলেও তারা তা করে না। তাদের মধ্যে কর্তব্যে অবহেলা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, গোঁজামিল দিয়ে হিসাবের কাজ সম্পন্ন করছে। ফলে হিসাবের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে না। হিসাবের প্রক্রিয়াগত সমস্যার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিজিএ অফিস তার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে না। ফলে পরবর্তী বছরের বাজেটে এর একটি প্রভাব পরে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হয়।

অন্যদিকে এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ করার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সমস্যা রয়েছে তেমনি তাদের সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিনের পর দিন বিভিন্নভাবে হয়রানি, তাদের নিকট থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঘুষ গ্রহণ করার মত তথ্যও এই গবেষণায় উঠে এসেছে। তারা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে ঘুষ আদায়ের জন্য দিনের পর দিন বিল আটকে রাখে। আবার ঘুষের বিনিময়ে অনেক ত্রুটিপূর্ণ বিলও তারা সহজেই পাশ করিয়ে দেয়। নতুন বেতন স্কেল সংযোজন, প্রথম বেতন প্রাপ্তি, বোনাস প্রাপ্তি, ঠিকাদার বা কোম্পানির বিল পাশ, টিএডিএ বিল পাশ, কন্টিজেন্সি বিল পাশ, পেনশন প্রাপ্তি, টাইম স্কেল সংযোজন, চাকরি স্থায়ীকরণ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট সংযোজন করানোর মত মোট ২৩টি কাজে সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে ঘুষ আদায় করে বলে গবেষণায় তথ্য উঠে এসেছে। এ অফিসে দুইভাবে ঘুস আদায় হয়। কখনও ঘুষের পরিমাণ শতকরা হারে কখনও তা থোক হিসেবে আদায় করা হয়। ঘুষ আদায় সম্পর্কে সিজিএ অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-

কর্মচারীরা সত্যতা স্বীকার করেছেন। তবে এ বিষয়ে তাদের মতামত হচ্ছে সরকারি অফিসগুলোর দুর্নীতি ঢাকার জন্যই তারা সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ প্রদান করে থাকে। সিজিএ অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আইনগত সীমাবদ্ধতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি থেকে উত্তরণের জন্য টিআইবি কিছু সুপারিশ তুলে ধরছে যা কার্যকর করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। নিচে এই সুপারিশগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

নীতিগত উদ্যোগ

১. সিজিএ অফিসকে দ্বৈত ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করতে হবে। অর্থাৎ সিজিএ অফিস, সিএজি নাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা পরিষ্কার করতে হবে।

২. সংবিধান সংশোধন করে সিজিএ কে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে।

৩. সিজিএসহ সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে সিজিএর পদটি গ্রেড ১ করার মাধ্যমে নিম্নের এডিশনাল সিজিএ, সিএও, এএও, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অডিটরদের গ্রেড বৃদ্ধি করতে হবে

৪. সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে যোগ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করতে হবে। দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সকল প্রকার নৈতিক আচরণ বিধি লঙ্ঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই কমিটির নিকট তাদের অভিযোগ দাখিল করবেন এবং কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

সেবাগ্রহীতাদের সংক্ষুব্ধ (grievance) প্রক্রিয়া সংক্রান্ত

৫. সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য সিজিএতে একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে। যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের সমস্যা নিয়ে এই ন্যায়পালের নিকট অভিযোগ দাখিল করবে এবং ন্যায়পাল তার সুষ্ঠু সমাধান দিবে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিক সংক্রান্ত

৬. সিজিএ অফিসের সকল কার্যক্রম অটোমেটেড (স্বয়ংক্রিয়) করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোকেও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি সরকারি অফিসের সাথে সিজিএ অফিসের হিসাবের লিঙ্ক থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও বাজেট নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সিজিএ অফিসের কাজে যাতে কোনো রকম ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য জেনারেটর বা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. জেলা ও উপজেলা পর্যায়সহ ঢাকা অফিসেও কাগজপত্র রাখার জন্য রুম, শেলফ, সরকারি ফরম, লেজার, একাউন্ট স্লিপ ইত্যাদিসহ অন্যান্য লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্গানোগ্রাম ও জনবল সংক্রান্ত

৯. বর্তমানে প্রয়োজনীয় জনবলের ভিত্তিতে সিজিএ অফিসের অর্গানোগ্রাম নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে।

১০. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। সকল শূন্য পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে।

১১. সিজিএ অফিসে কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তার দ্রুত সমাধান করে যোগ্য কর্মচারীদের পদোন্নতি দিতে হবে। তিন বছর পর পর পদোন্নতির যে বিধান রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

১২. এএওদের (নন ক্যাডার) পদোন্নতির পদ সংখ্যা ২০% করতে হবে

১৩. নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা অনুমোদন দিতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা সিজিএ'র থাকতে হবে।

১৪. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

১৫. সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা অনুমোদন দিতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের সাথে মিল রেখে যুগোপযোগী ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি না তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে প্রশিক্ষণ সেন্টার গঠন করতে হবে।

১৬. যে ব্যক্তির যে কাজে বেশি দক্ষতা রয়েছে তাকে সেখানে কাজে লাগাতে হবে। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে নির্বাচন করতে হবে।

১৭. বিদেশে মিশন অডিট করার জন্য সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সুযোগ দিতে হবে।

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১৮. বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং তা যাচাই করতে হবে। বৈধ সূত্রের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত আয় বা সম্পদ আহরণ বা অন্য কোনোরূপ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে নাগরিক সনদটিকে পুনঃপ্রণয়ন করতে হবে। এখানে সেবা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে। অভিযোগ দাখিল ও তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সিজিএ অফিসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য থাকতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা হালনাগাদ করতে হবে। প্রতিটি সরকারি অফিসে এই নাগরিক সনদ পৌঁছে দিতে হবে যাতে এসব অফিসের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে সচেতন হতে পারে।

২০. আইন এবং আইনের সংশোধনগুলো একত্রিত করে তা বই আকারে প্রকাশ করতে হবে যাতে মানুষ সকল আইন সম্পর্কে অবগত থাকতে পারে।

কার্যক্রম মনিটরিং সংক্রান্ত

২১. সিজিএর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও কার্যক্রম মনিটর করার জন্য দক্ষ জনবলের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি সেল বা উইং গঠন করতে হবে।

২২. অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে জুন মাসে সারা বছরের ২০% এর বেশি বিল না পাঠানোর আদেশ পাঠাতে হবে।

২৩. সিজিএ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যাতে সিজিএ অফিসের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটর করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় বিল আটকে রাখলে তার জন্য সিজিএসহ অন্যান্য কর্মকর্তা তাকে ডেকে ব্যাখ্যা চাইবে এবং তা নিয়মিত মনিটর করতে হবে।

২৪. পরিদর্শন-অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা ও দক্ষতা-শৃংখলা শাখায় দক্ষ লোক নিয়োগ করে এ শাখাগুলোকে আরো কার্যকর করতে হবে। একই সাথে পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা এবং দক্ষতা - শৃংখলা শাখার মধ্যে একটা সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৫. বিধি-পদ্ধতি শাখা ১ ও ২ কে একত্র করে একটি শাখা করতে হবে এবং এ শাখাটিকে দক্ষ জনবল ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা দিয়ে কার্যকর করতে হবে।

হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত

২৬. ধীরে ধীরে (৩/৪ বছর ধরে) ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব থেকে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাবের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

২৭. ক্যাশ হিসাব ব্যবস্থা থেকে অ্যাক্রুয়াল হিসাব ব্যবস্থায় অগ্রসর হতে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তা প্রয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

২৮. যেসকল পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হবে সেসকল ক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত পরিমান জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।

২৯. হিসাব ব্যবস্থা পরিবর্তনে পর্যাপ্ত পরিমানে সম্পদ থাকতে হবে।

৩০. আর্থিক বিবরণ উপস্থাপনে যা কিছু সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তা অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিতে করা হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

৩১. অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় আর্থিক বিবরণ তৈরীর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। শুধু মাত্র অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় আর্থিক বিবরণ তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তা নয় কিভাবে তা বিশ্লেষণ করা হবে সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

তথ্যসূত্র

ট্রেজারী রুল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, www.mof.gov.bd
জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, www.mof.gov.bd
মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১
মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট ১ ও পার্ট ২, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১
এম.এ. হাই, সরকারি হিসাব ব্যবস্থা, মার্চ ২০১০
Code of Ethics, Office of the Comptroller and Auditor General, Bangladesh
The Government Servant (Conduct) Rules, 1979, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division
CGA Manuals, CGA Website - www.cga.gov.bd
আল-ফারুক এম. এম, অ্যাকাউন্ট্ কোড (বঙ্গানুবাদ), জুন ১৯৯৭
চক্রবর্তী রনজিৎ কুমার, ট্রেজারী রুলস এবং উহার অধীন প্রণীত সাবসিডিয়ারি রুলস্, (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯
চক্রবর্তী রনজিৎ কুমার, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস, (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯
www.cga.gov.bd
www.cag.gov.bd
www.moesta.gov.bd
Bangladesh; Financial Accountability for Good Governance, The World Bank, Washington, D.C., 2002
Public Sector Accounting and Auditing, The World Bank, www.worldbank.org.bd
Inaugural address by Mr. Vijayendra N. Kaul, C&AG of India, 7th November 2002
K. P. Kaushik, Government Accounting: Recent trends and direction for Idia, January 2006, icai.org/resource_file/103251018-1029.pdf, March 2011
২৯ মে ২০১০, bdnews24.com
১A Study on Accrual-Based Accounting for Governments and Public Sector Entities (PSEs) in SAARC countries, www.esafa.org/.../Study Accrual_Accounting_in_SAARC_Governments_1. pdf
Snyder Stan, Understanding cash and accrual basis accounting, http://office.microsoft.com/en-us/support/understanding-cash-and-accrual-basis-accounting-HA010164612.aspx
Accounting and Auditing in Pakistan, http://www.adb.org/Documents/Books/Financial_Mgt/Pakistan/chap_02.pdf
Accounting system in India, www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/25434/1/Unit-21.pdf
Accounting and Auditing System in Sri Lanka, http://www.adb.org/documents/books/diagnostic_study_accounting_auditing/sri/chap_02.pdf
Government Rules and Regulation, http://www.rhd.gov.bd/RulesAndRegulations/View_Overview.asp?Ref=F on 20 September 2011

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: সিজিএ অফিসের অরগানোগ্রাম

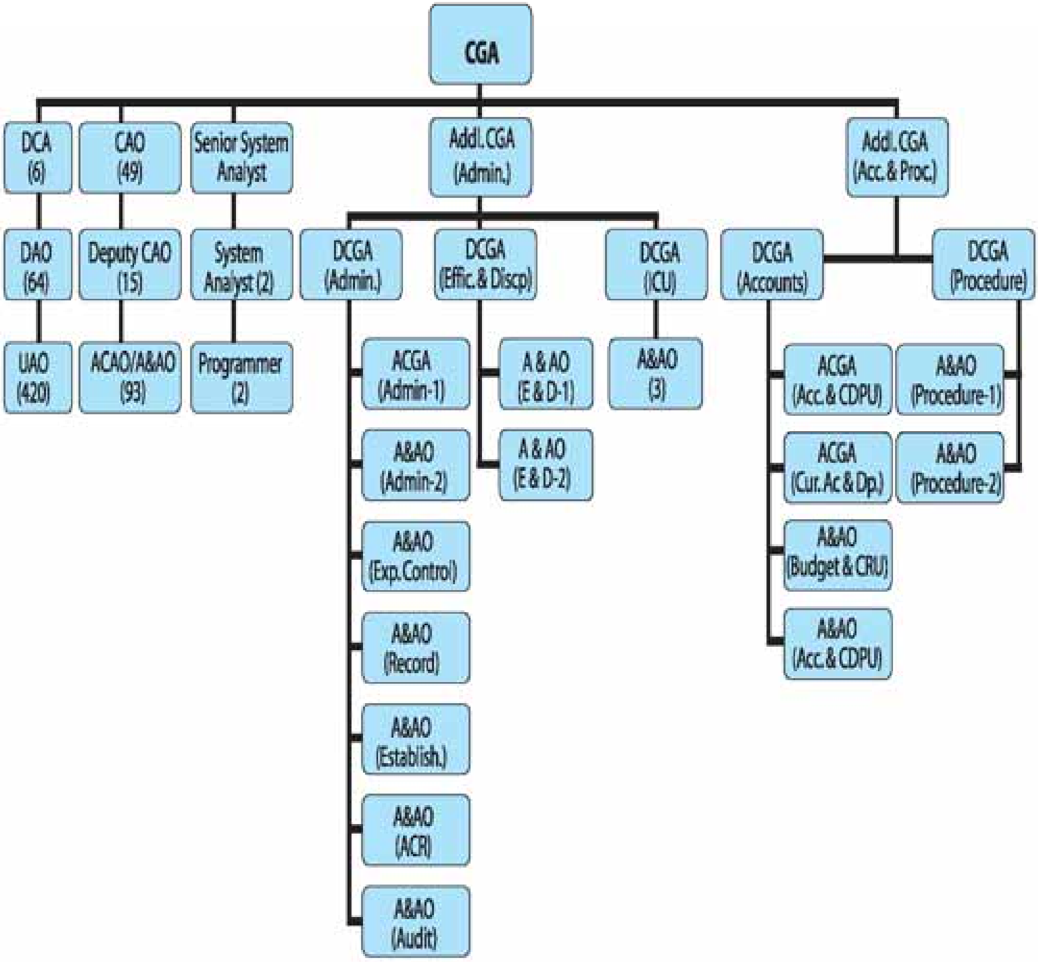

পরিশিষ্ট ২:সিজিএর ১৫টি শাখার কার্যাবলী

ক্রমিক নং	বিভাগ	কার্যাবলী
১	প্রশাসন -১	এই শাখাটি সিজিএ অফিসের সকল গেজেটেড কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন, চাকরির শর্তাবলী, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক বিষয়াবলী যেমন পেনশন, অগ্রিম প্রাপ্য অর্থ প্রদান, ছুটি, ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয় এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করে।
২	প্রশাসন -২	এই শাখাটি সিজিএ অফিসের সকল নন গেজেটেড কর্মকর্তাদের বদলি, পোস্টিং, চাকরির শর্তাবলী, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক বিষয়াবলী যেমন পেনশন, অগ্রিম প্রাপ্য অর্থ প্রদান, ছুটি, ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয় এবং অভিযোগ নিয়ে কাজ করে।
৩	স্থাপনা	সিজিএ অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল ধরনের প্রদেয় বিল, ভাতা ও কন্টিজেন্সি বিল এই শাখাটি তৈরি করে। সকল ধরনের ক্রয় ও সংগ্রহ এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্ভিসবুক সংক্রান্ত কার্যক্রম এই শাখা পরিচালনা করে।
৪	ব্যয় নিয়ন্ত্রণ	এই সেকশনটি সিজিএ অফিসের বাজেট তৈরি, বাজেট সংশোধন ও বাজেট প্রস্তাবনা তৈরি করে, বেতন-ভাতাসহ সকল কন্টিজেন্সি বিল নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সংশ্লিষ্ট অফিসের ব্যয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসের ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোও এই সেকশন দেখাশুনা করে। এটি টেলিফোন, বিনোদন ছুটি ও পারিতোষিকসহ সংশ্লিষ্ট তহবিল পরিচালনা করে।
৫	রেকর্ড	এই সেকশনটি প্রধানত চিঠিপত্র লেনদেনের বিষয়টি দেখাশুনা করে। সকল মজুদ ও দ্রব্যাদির সংরক্ষণ করে। সিজিএ অফিসের প্রয়োজনীয় চেক প্রিন্ট, ব্যাংক থেকে ক্যাশ অর্থ উত্তোলণ, পুরোনো তথ্যের সংরক্ষণ, লাইব্রেরি পরিচালনা, অফিসের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি বন্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলো এই সেকশনের দ্বারা সঠিকভাবে তদারকি করা হয়। ফরম সংশোধন ও অনুমোদন, ম্যানুয়াল সংশোধন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা প্রয়োগকারী সেলে প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদি কাজও এই সেকশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
৬	সমন্বয় ও এসিআর	সিএও, ডিসিএ, ডিএও ও ইউএও অফিস থেকে যেসব প্রতিবেদন ফেরত পাটানো হয় সেগুলোর উপরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এই বিভাগ থেকে নেওয়া হয়। সিএও, ডিসিএ, ডিএও ও ইউএও অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট এই বিভাগে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।
৭	পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ	সিজিএ অফিসের কাজ সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করাই এই বিভাগের প্রধান কাজ। এই সেকশনটি সিএও, ডিসিএ, ডিএও ও ইউএও অফিসগুলো পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করে।
৮	বিধি ও কার্যপ্রণালি	এই সেকশনটি সরকারের বিভিন্ন আদেশ অনুসন্ধান, যাচাই ও সত্যায়ন করে। কোড এবং ম্যানুয়ালে বর্ণিত বিভিন্ন নিয়মের ব্যাখ্যা এই সেকশন তৈরি করে। আদালতের মামলা মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান এই সেকশনটি করে থাকে। বিভিন্ন অফিসের দ্বারা যেসব জটিল কেস পাঠানো হয় সে কেসগুলোর জন্য এই সেকশন থেকে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বকেয়া ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য এই সেকশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

৯	দক্ষতা ও শৃঙ্খলা-১	ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও দক্ষতা জনিত বিষয়গুলো এই বিভাগ দেখাশুনা করে।
১০	দক্ষতা ও শৃঙ্খলা-২	খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও দক্ষতা জনিত বিষয়গুলো এই বিভাগ দেখাশুনা করে।
১১	অডিট	সিএজি অফিস থেকে সিজিএ অফিসের উপরে যে সিভিল অডিট করা হয় সেই অডিটের আপত্তির উত্তর ও মতামত লিখে পাঠানোর দায়িত্ব এই শাখার।
১২	পুরোনো ফান্ড ও পেনশন	পেনশন হোল্ডারদের পিপিও সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্তগুলোকে এই শাখা গুছিয়ে রাখে। সকল অফিসকে জিপিএফ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা এই শাখার কাজ। জিপিএফ এর সারমর্ম রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যালান্স হাল নাগাদ করে সংরক্ষণ ও স্থানান্তর, অভ্যন্তরীণ অফিস বিবরণী স্থানান্তর, পিয়ারিং শিট ও রেজিস্টার স্থানান্তর, কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সাক্ষর সংরক্ষণ করা ইত্যাদি কাজগুলোও এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
১৩	হিসাব ও সিডিপিইউ	মাসিক হিসাব তৈরি, ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত হিসাবের সংকলন, শ্রেণী বিন্যাস্ত চার্টের কাজ, নতুন হিসাব খোলা, দেশীয় ও বিদেশী ঋণের সামঞ্জস্য বিধান, আর্থিক ও উপযোজন হিসাব তৈরি, তহবিল ছাড়ার কর্তৃত্ব, হিসাবের তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ সম্পর্কিত চেক ও ভাউচার পরীক্ষা ও তা সংশ্লিষ্ট অফিসের নিকট প্রেরণ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সিএজি ও অন্যান্য অফিসের প্রয়োজন অনুসারে তথ্য ও উপাত্তের সংরক্ষণ করা এই শাখার কাজের মধ্যে পরে।
১৪	বাজেট ও সিআরইউ	সরকারের বাজেটের জন্য হিসাব তৈরি করা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের চেকের সমন্বয়ের ভিত্তিতে আয় ব্যয়ের বিবরণী বাংলদেশ ব্যাংকে প্রেরণ, প্রতিমাসে গড়মিল (মিস-ম্যাচ) ও অমিল হওয়া অর্থের (আন-ম্যাচ) হিসাব তৈরি, মাসিক হিসাবের মধ্যে বকেয়া বিল ও চেকের লিস্ট অন্তর্ভূক্ত করা এই শাখার কাজ।
১৫	চলতি হিসাব ও সঞ্চয়	মাসিক বিনিময় হিসাব ও মীমাংসিত হিসাব সমন্বয় ও সরবরাহ করা, নতুন পিএল হিসাব খোলা, পিএল, পিএলআই, বিএফ ও জিআই এর জন্য বোর্ড শিট তৈরি করা, মাসিক বিএফ ও জিআই এর বিবরণ পাঠানো এই শাখাটি করে থাকে।

পরিশিষ্ট ৩: জনবলের বিবরণ

সিজিএ কার্যালয়ের জনবল

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
পদের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
মঞ্জুরীকৃত	২৪	১৮	১৯৪	৩৪	২৭০
কর্মরত	২২	৯	১৫৪	৩৪	২১৯
পুরুষ	২০	৯	৮৬	২২	১৩৭
নারী	২	০	৬৮	১২	৮২

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
পদের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
মঞ্জুরীকৃত	১৫৭	২০১	১৯৩৭	২৪৭	২৫৪২
কর্মরত	১৬১	১১৯	৯৯৬	১৬৭	১৪৪৩
পুরুষ	১২৫	৯৯	৭১৭	১১৪	১০৫৫
নারী	৩৬	২০	২৭৯	৫৩	৩৮৮

বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কার্যালয়

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
পদের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
মঞ্জুরীকৃত	৩৮	৪৭	৩৮১	৮৭	৫৫৩
কর্মরত	৪১	৪২	২৪৬	৫৩	৩৮২
পুরুষ	৩৮	৩৯	২০৫	৪৮	৩৩০
নারী	৩	৩	৪১	৫	৫২

জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের জনবল

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
পদের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
মঞ্জুরীকৃত	৫৮	১১৬	৭৯৪	১১৬	১০৮৪
কর্মরত	৫৮	৫৫	৬৬১	১০৪	৮৭৮
পুরুষ	৫৮	৫৩	৬০০	১০০	৮১১
নারী	০	২	৬১	৪	৬৭

উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের জনবল

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
পদের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
মঞ্জুরীকৃত	৪১৮	৪০০	২০৪৫	৪১৮	৩২৮১
কর্মরত	৩৭৫	০	১৩২৫	২৬০	১৯৬০
পুরুষ	৩৭৩	০	১২৫২	২৪৬	১৮৭১
নারী	২	০	৭৩	১৪	৮৯

সার্বিকভাবে পদ অনুসারে জনবলের চিত্র

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূণ্য পদ	শূণ্য পদের শতকরা হার
১ম শ্রেণী	৬৯৫	৬৫৭	৩৮	৫.৪৬
২য় শ্রেণী	৭৮২	২২৫	৫৫৭	৭১.২২
৩য় শ্রেণী	৫৩৫১	৩৩৮২	১৯৬৯	৩৬.৭৯
৪র্থ শ্রেণী	৯০২	৬১৮	২৮৪	৩১.৪৮
সর্বমোট	৭৭৩০	৪৮৮২	২৮৪৮	৩৬.৮৪

পরিশিষ্ট ৪: হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

সরকারের হিসাব তৈরীর ব্যবস্থাকে চারটি শ্রেণীতে বিশেষায়িত করা যায়। যেমন:

১. ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব
২. মোডিফাইড ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব
৩. মোডিফাইড অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব
৪. অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব

নগদ হিসাব (ক্যাশ একাউন্টিং): ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় ক্যাশ সম্পদের প্রবাহটাকে (Flow) পরিমাপ করা হয়। শুধুমাত্র যখন ক্যাশ আদান প্রদান হয় তখনই তা হিসাবের আওতায় আনা হয়। ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব প্রতিবেদনে যা থাকে তা হলো ক্যাশ গ্রহণ, ক্যাশ প্রদান, হিসাব শুরু এবং শেষের ব্যালেন্স। যখন ক্যাশ গ্রহণ করা হয় তখন তা সরকারের আয় ধরা হয়। যখন দাবী সমূহ পরিশোধ করা হয় তখন তা ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

সঞ্চয়ন হিসাব (অ্যাক্রুয়াল একাউন্টিং): অ্যাক্রুয়াল হিসাব হলো এমন একটি ব্যালেন্স শিট যেখানে সকল প্রকার দায় এবং সম্পদের (নগদ বিহীন) বিবরণ থাকে। গ্রহণ ও প্রদানযোগ্য সকল হিসাব, ব্যবসায়ী সুনাম/সুযোগ, করের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ভবিষ্যত বিনিয়োগ ব্যয়। এটি আর্থিক বিবরণে তথ্যের পরিমান বৃদ্ধি করে। ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যেও অপর্যাপ্ততা থাকে। যেমন, ক্রেডিটের ভিত্তিতে রাজস্ব, ভবিষ্যত সম্ভাবনা বা দায় এসব তথ্যের অনুপস্থিতি থাকে। এক্রুয়াল হিসাব ব্যবস্থায় একটি কোম্পানি কার নিকট কী ধরণের ঋণ এর দায়ে থাকবে এবং কী ধরণের রাজস্ব আদায় সম্ভব তা পরিমাপ করে। এই হিসাবে সেই সম্পদের হিসাবও অন্তর্ভূক্ত করে যার কোনো ক্যাশ ভ্যালু নেই, যেমন, ব্যবসায়িক সুনাম/সুযোগ।

ক্যাশ এবং এক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র:

ক্যাশ ভিত্তিক হিসাব খুবই সাধারণ হিসাব। কোনো দ্রব্য বা সেবা পণ্য বিক্রয়ে যে ক্যাশ গ্রহণ করা হয়, তা সঞ্চয় হিসেবে গণনা করা হয় এবং তহবিল গ্রহণের তারিখ হতে রাজস্ব রেকর্ড করা হয়। কিন্তু কখন পণ্য বিপণন হয়েছে তা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। চেক তখনই তৈরী করা হয় যখন তহবিল থাকে, এবং চেক প্রদানের তারিখেই তা ব্যয় হিসেবে রেকর্ড করা হয়, কিন্তু কখন এই ব্যয়ের দায়ে দায়গ্রস্ত হয়েছে তা বিবেচনা করা হয় না। এর প্রাথমিক ফোকাস হলো ব্যাংকে গচ্ছিত ক্যাশের পরিমান, দ্বিতীয় ফোকাস হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে, সকল বিল প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোন সময়ের মধ্যে এই রাজস্ব আয় করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখা হয়না।

এক্রুয়াল ভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থায় যে সময়ে রাজস্ব আয় করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখা হয় এবং যে সময়ে ব্যয়ের দায়ে দায়গ্রস্ত হয় সে সময়ের সাথে ব্যয়টি সামঞ্জস্য করা হয়। যদিও এ ব্যবস্থাটি ক্যাশ ভিত্তিক ব্যবস্থার চেয়ে জটিল, তথাপিও এ ব্যবস্থাটি বহুবিদ তথ্য তুলে ধরে।

নগদ হিসাব	সঞ্চয়ন হিসাব
রাজস্ব যে সময়ই আয় হোক না কেন, রাজস্ব গ্রহণের	রাজস্ব যে সময়েই গ্রহণ করা হোক না কেন, রাজস্ব
পর তা রেকর্ড করা হয় যে সময়েই ব্যয়ের দায়ে দায়গ্রস্ত হোক না কেন,	আয়ের সাথে সাথেই তা রেকর্ড করা হয় যে সময়েই পরিশোধ করা হোক না কেন, ব্যয়ের
পরিশোধ করার পর তা ব্যয় ধরা হয়। কখন রাজস্ব আয় হলো এবং কখন ব্যয়ের দায়ে	দায়ে দায়গ্রস্ত হবার পর পরই তা ব্যয় ধরা হয় রাজস্বসমূহ আয়ে যে ধরনের ব্যয়ের দায়ে দায়গ্রস্ত
দায়গ্রস্ত হলো তা বিবেচনা না করে, লেনদেনের ভিত্তিতে রাজস্ব এবং ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক বিবরণ	হয়েছে তা মিলিয়ে আর্থিক বিবরণ তৈরী করা হয় এবং সঠিকভাবে সকল তথ্য তুলে ধরা হয়

তুলে ধরা হয় গ্রহণযোগ্য কোনো হিসাব এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না	বিক্রয়ের ভিত্তিতে রাজস্ব গ্রহণ করা না হলেও তা
প্রদানযোগ্য কোনো হিসাব এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না	গ্রহণযোগ্য হিসেবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ক্রয়ের ভিত্তিতে ক্রয়ের সময়ে তা পরিশোধ করা না
আংশিক প্রদান সংক্রান্ত হিসাব রাখার কোনো পদ্ধতি	হলেও তা প্রদানযোগ্য হিসেবে হিসাবে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাজস্ব এবং ব্যয়সমূহ পুরোপুরি রেকর্ড করা হয়
এখানে নেই	

পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন দেশের হিসাব বিবরণী সম্পর্কিত তথ্য

দেশ	এক্রুয়াল একাউন্টিং (পৃথক পৃথক এজেন্সি/ডিপার্টমেন্ট এর জন্য)	সমন্বিত এক্রুয়াল রিপোর্টিং	এক্রুয়াল বাজেটিং
অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৫ থেকে	১৯৯৭ থেকে	আর্থিক বছর ২০০০ থেকে
অস্ট্রিয়া	না*	না	ইএসএ ৯৫. মডিফাইড এক্রুয়াল
বেলজিয়াম	কিছু	না	ইএসএ ৯৫. মডিফাইড এক্রুয়াল
কানাডা	আর্থিক বছর ২০০২ থেকে	আর্থিক বছর ২০০২ থেকে	হ্যাঁ
চেক রিপাবলিক	না*	না	না, কিন্তু ইএসএ ৯৫.অনুযায়ী . মডিফাইড এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হবে
ডেনমার্ক	কিছু	কিছু	ইএসএ ৯৫. পূর্ণ এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হচ্ছে
ফিনল্যান্ড	১৯৯৮ থেকে	১৯৯৮ থেকে	ইএসএ ৯৫. হ্যাঁ
ফ্রান্স	প্রচলিত হচ্ছে	কিছু, পূর্ণ এক্রুয়াল প্রচলিত হচ্ছে	ইএসএ ৯৫. মডিফাইড এক্রুয়াল ভিত্তির দিতে অগ্রসর হওয়ার অভিপ্রায় রয়েছে
জার্মানী	ক্যাশ স্টেটম্যান্ট এর সাথে এক্রুয়াল তথ্য সম্পূরক হিসেবে সংযুক্ত	না	ইএসএ ৯৫. প্রস্তুতিপর্বে রয়েছে
গ্রীস	কিছু	হ্যাঁ	ইএসএ ৯৫. মডিফাইড এক্রুয়াল
হাঙ্গেরি	ক্যাশ স্টেটম্যান্ট এর সাথে এক্রুয়াল তথ্য সম্পূরক হিসেবে সংযুক্ত	না	না, কিন্তু ইএসএ ৯৫.অনুযায়ী . মডিফাইড এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হবে
আইসল্যান্ড	১৯৯২ থেকে	১৯৯২ থেকে	ইএসএ ৯৫. ১৯৯৮ থেকে
আয়ারল্যান্ড	ক্যাশ স্টেটম্যান্ট এর সাথে এক্রুয়াল তথ্য সম্পূরক হিসেবে সংযুক্ত	না	ইএসএ ৯৫. মডিফাইড এক্রুয়াল
ইতালি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ইএসএ ৯৫. হ্যাঁ
জাপান	হ্যাঁ	হচ্ছে	না
কোরিয়া	পূর্ণ এক্রুয়াল একাউন্টিং প্রচলিত হচ্ছে	না	পূর্ণ এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলিত হচ্ছে
লুক্সেমবার্গ	না*	না	ইএসএ ৯৫
মেক্সিকো	না*	না	হাঁ
দ্যা নেদারল্যান্ডস	আর্থিক বছর ১৯৯৪ থেকে	হচ্ছে	ইএসএ ৯৫. এজেন্সিসমূহের জন্য ১৯৯৭ থেকে প্রচলিত। পূর্ণ এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলিত হচ্ছে
নিউজিল্যান্ড	আর্থিক বছর ১৯৯২ থেকে	আর্থিক বছর ১৯৯২ থেকে	আর্থিক বছর ১৯৯৫ থেকে
নরওয়ে	না*	না	না
পোল্যান্ড	কিছু	কিছু	না, কিন্তু ইএসএ ৯৫.অনুযায়ী . মডিফাইড এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হবে
পর্তুগাল	হ্যাঁ	না	ইএসএ ৯৫. অতিরিক্ত এক্রুয়াল তথ্য প্রচলন করা হচ্ছে
স্লোভাক রিপাবলিক	না*	না	না, কিন্তু ইএসএ ৯৫.অনুযায়ী . মডিফাইড এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হবে

স্পেন	মডিফাইড এক্রুয়াল	মডিফাইড এক্রুয়াল	ইএসএ ৯৫. মডিফাইড ক্যাশ
সুইডেন	১৯৯৪ থেকে	১৯৯৪ থেকে	ইএসএ ৯৫. পূর্ণ এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হচ্ছে
সুইজারল্যান্ড	হ্যাঁ	না	পূর্ণ এক্রুয়াল বাজেটিং প্রচলন করা হচ্ছে
তার্কি	না*	না	না
যুক্তরাজ্য	আর্থিক বছর ২০০০ থেকে	আর্থিক বছর ২০০৬ থেকে	আরএসএ ৯৫. আর্থিক বছর ২০০২ থেকে
যুক্তরাষ্ট্র	আর্থিক বছর ১৯৯৮ থেকে	আর্থিক বছর ১৯৯৮ থেকে	কিছু
*এই সকল দেশগুলোর বেশিরভাগই মডিফাইড ক্যাশ একাউন্টিং ব্যবহার করে। ইএসএ- ইউরোপিয়ান সিস্টেম অব একাউন্টস্, ইউ সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে ইএসএ ৯৫ অনুযায়ী আর্থিক বিবরণ তৈরী করতে হয়।			

তথ্য সূত্র: Athukorala Sarath Lakshman, (2003) Accrual Budgeting and Accounting in Government and its relevance for developing member country, Asian Development Bank, Philippines, pp 12-14.(Modified) cited in K. P. Kaushik, Government Accounting: Recent trends and direction for Idia, January 2006

টিআইবি'র কার্যক্রম

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুনের কার্যকর প্রয়োগের চাহিদা সৃষ্টি ও সুশাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে 'হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

9789843379818